Mark Twain

Best Story Collection
Bangla translation
www.banglainternet.com

8 Story Collection

সূচি

মৃত্যুচক্র ৯
একটি প্রেমকথা ১৮
দশলক্ষ পাউন্ডের নোট ২৩
সে কি জীবিত না মৃত ৪০
একটি আশ্চর্য স্বপ্ন ৪৮
একটি উপকথা ৫৪
নরখাদক ৫৬
জীবনের পাঁচটি উপহার ৬৩

এক

অলিভার ক্রমওয়েলের সময়ের কাহিনী। কমনওয়েলথ সেনাবাহিনীতে তাঁর সমসাময়িক পদস্থ অফিসারদের মধ্যে ত্রিশ বছর বয়স্ক কর্নেল মেফেয়ার ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। সতের বছর বয়সে সামরিক জীবনের শুরু করে যুদ্ধে দীর্ণ পিঙ্গল শরীর নিয়ে তখন কর্নেল এই অল্প বয়সেও একজন নিপুণ সৈনিক। বহু রণক্ষেত্রে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন এবং নিজের শৌর্য প্রদর্শন করে ক্রমে ক্রমে সেনাবাহিনীতে উচ্চপদ ও সাধারণ্যে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তবু এই মুহূর্তে গভীর অস্থিরতায় নিমগ্ন, তাঁর ভাগ্যের ওপর কোত্থেকে এক ছায়া নেমে এসেছে।

শীতার্ত সন্ধ্যায় তখন বাইরে ঝড়ের মাতলামো আর অন্ধকার। ভেতরে বিষণ্ন নির্জনতা। কারণ, কর্নেল এবং তাঁর তরুণী স্ত্রী তখন কথার উত্তাপে তাঁদের বেদনাকে অপসারিত করার চেষ্টা করে নিশ্চুপ। অপরাহ্নের পাঠের অধ্যায় আর প্রার্থনা সমাপ্ত করে তখন তাঁদের হাতে হাত রেখে নির্জন হয়ে বসে চুল্লির আগুনের দিকে চেয়ে থাকা, চিন্তার আলস্যে নিজেদের সমর্পিত করে অপেক্ষায় দীর্ঘ প্রহর গোনা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না। তাঁরা জানতেন, তাঁদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আর সে-কথা চিন্তা করেই কর্নেলের স্ত্রী থরথর করে কেঁপে উঠল এক সময়।

সাত বছর বয়সের কন্যা এ্যাবি ছিল তাঁদের প্রাণপ্রতিম একমাত্র সন্তান। এক্ষুনি হয়ত সে আসবে শুভরাত্রির বিদায়-চুমু খেতে। আর সেজন্যই বোধ হয় কর্নেল এই বিষণ্ন নীরবতা ভাঙলেন। বললেন,

: অন্তত ওর জন্যে তোমার চোখের পানি এবার মুছে ফেল। এস, আমরা সব ভুলে সুখি হই। অল্পক্ষণের জন্য হলেও যা ঘটবে, তাকে ভুলে থাকতে হবে আমাদের।

: বেশ, তাই হবে। কান্নায় ভেঙে পড়লেও আমি সব ভুলে যাব। নিঃসঙ্গ হয়ে অন্ধকারে ডুবে থাকব।

: হ্যাঁ, আমাদের নিয়তিকে আমরা গ্রহণ করব, বহন করব অবিচলিত ধৈর্যে। জানব তিনি যা করেন, তা-ই সত্যিকারে ন্যায় আর সত্যিকারের দয়া—।

: তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি তাই কামনা করি—আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি যদি তাই বলতে পারতাম। যদি পারতাম, এই প্রিয় হাত যাকে আমি শেষবারের মতো স্পর্শ করছি, চুমু খাচ্ছি—

: লক্ষ্মীটি চুপ কর, ওই সে আসছে!

রাত্রিবাস পরিহিত কোঁকড়ানো চুল ছোট্ট একটি শরীর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। ছুটে গেল বাবার দিকে। আর ছোট্ট মেয়েকে বুকে চেপে ধরে বারবার চুমু খেলেন কর্নেল মেফেয়ার।

: তুমি আমাকে ওভাবে চুমু খাচ্ছ কেন বাবা? আমার চুল যে নষ্ট হয়ে যাবে।

: না মা, আমাকে ক্ষমা কর। আমি আর ওভাবে চুমু খাব না।

: সত্যি বাবা, সত্যি করে বল, তুমি দুঃখ পেয়েছ?

: তুই নিজে বুঝতে পারছিস না, মা। কর্নেল এবার নিজের দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

বাবার এই করুণ অবস্থা দেখে ছোট্ট মেয়ে এ্যাবি এবার কেঁদে উঠল। বাবার হাত-দুটো নিজের হাত দিয়ে টেনে বলল,

: না বাবা তুমি কেঁদো না, কেঁদো না। আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাই নি বাবা। আমি আর কোনোদিন এমনটি বলব না। বাবা তুমি কেঁদো না।

বাবার হাত দুটো টেনে এবার খানিকটা সরিয়ে আনল এ্যাবি। বাবার চোখ-দুটো দেখতে পেল। আর দেখেই উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল,

: তুমি কী দুষ্টু বাবা! তুমি একটুও কাঁদছ না। তুমি একটুও দুঃখ পাও নি। তুমি শুধু শুধু আমাকে বোকা বানাচ্ছ। আমি আর তোমার কাছে থাকব না। এই আমি মায়ের কাছে চললাম। এই বলে এ্যাবি সত্যি বাবার কোল থেকে নেমে যাচ্ছিল। কিন্তু ওর বাবা এবার ওকে দু-হাতে কাছে টেনে আনলেন। জড়িয়ে ধরে বললেন,

: না মা, তুই আমাকে ছেড়ে যাবি না। আমি দুষ্টু ছিলাম, এটা স্বীকার করছি কিন্তু আর আমি দুষ্টু থাকব না, মা। আর তুই আমাকে যা শাস্তি দিবি, আমি তা মেনে নেব। বল মা, বল।

ছোট্ট মেয়ে এ্যাবি তক্ষুনি শান্ত হয়ে এল। আগের সেই প্রফুল্লতা ফিরে এল তার মুখে। বাবার গালে সে তার ছোট্ট হাত দিয়ে আদর করতে করতে বলল,

: তবে একটা গল্প বল না বাবা, একটা খুব ভালো গল্প।

: বাইরে কেমন একটা শব্দ হল অকস্মাৎ। সবারই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল প্রায়। উৎকর্ণ হল সবাই। বাতাসের উদ্দামতার মধ্যে সহসা বুঝি ক্ষীণ পায়ের শব্দ শোনা গেল। ক্রমশ সেই শব্দ নিকট থেকে নিকটতর হল, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। নিঃসঙ্গ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সবাই। আর কর্নেল তাঁর ছোট্ট মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন,

: একটা গল্প, না মা? খুশির গল্প?

: না বাবা, খুশির গল্প নয়, একটা খুব ভয়ানক গল্প।

বাবা একটা খুশির গল্প বলতে চাইলেন। কিন্তু মেয়ে নাছোড়বান্দা। সে ভয়ানক একটা গল্প শুনবেই। বাবার সঙ্গে তার শর্ত ছিল। সে যা চাইবে তাই হবে। বাবা তার একজন খ্যাতনামা সৈনিক। তিনি কথা দিয়েছেন সে কথা রাখতেই হবে। ছোট্ট মেয়ে এবার বলল, না বাবা, আমাদের সবসময় খুশির গল্প শোনা উচিত নয়। ধাই-মা বলে, মানুষের সব সময় খুশিতে কাটে না। আচ্ছা বাবা, এটা কি সত্যি? ধাই-মা তাই বলে বাবা। তুমি বল না, সত্যি কি না?

মা কেমন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তাঁর সমস্ত চিন্তা তাঁর আগেকার সেই অস্থিরতায় নিমজ্জিত হল। শান্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ মা এটা সত্যি। আমাদের দুঃখ আসে। করুণ, কিন্তু তবু এটা সত্যি মা।

তাহলে সেই রকম একটা গল্প বল, বাবা। যেন আমরা ভাবতে পারি আমরাই সেই গল্পের লোক। এমন গল্প বল বাবা, যাতে আমরা ভয়ে সব কাঁপতে থাকি। মা, তুমি আরো কাছে এসে বস। আমার একটা হাত ধর। যাতে আমরা ভয়টাকে কাটাতে পারি। এবার তুমি শুরু কর, বাবা।

কর্নেল নিজেই ইচ্ছে করে একটু নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, একদা

এক সময়ে তিনজন কর্নেল ছিলেন—।

: হা খোদা! আমি কর্নেলদের জানি। তুমিই তো একজন কর্নেল, বাবা। বল—

: একবার এক যুদ্ধে সেই কর্নেলরা একটা আইন ভঙ্গ করলেন।

বাবার কথা শুনে ছোট্ট মেয়ে এ্যাবি আনন্দিত হয়ে লাফিয়ে উঠল। বাবার দিকে মুখ তুলে বলল,

: কী ভাঙল, বাবা? কোনো খাওয়ার জিনিস?

মা আর বাবা দুজনেই এবার স্মিতভাবে প্রায় হেসে উঠলেন। তারপর বাবা বললেন,

: না মা, ঠিক তার উল্টো! সেই কর্নেলরা তাঁদের যা করা উচিত নয়, তাই করেছিলেন।

: কী করেছিলেন?

: না মা! যুদ্ধে যখন হেরে যাচ্ছে ঠিক তেমনি সময় ওদেরকে বলা হয়েছিল শত্রুসৈন্যের ওপর একটা প্রচণ্ড আক্রমণের ভান করতে যাতে করে কমনওয়েলথবাহিনী নিরাপদে পশ্চাদপসরণ করবার সুযোগ পায়। কিন্তু অতি উৎসাহী সেই তিনজন কর্নেল আক্রমণের ভান না করে শত্রুসৈন্যের ওপর সত্যি সত্যি আক্রমণ করে বসল। আর ঝড়ের মতন সেই আক্রমণে শত্রুসৈন্য বিপর্যস্ত হয়ে পরাজিত হল। লর্ড জেনারেল তাই তাদের ওপর খুব বিরক্ত হলেন, তাদের প্রশংসাও করলেন খুব—তারপর তাদের অপরাধের বিচারের জন্য তিনজনকেই লন্ডনে পাঠিয়ে দিলেন।

: তুমি কি মহান ক্রমওয়েলের কথা বলছ, বাবা?

: হ্যাঁ, মা।

: আমি তাঁকে দেখেছি, বাবা। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যখন তিনি বিরাট ঘোড়ায় চড়ে রাজসিকভাবে চলে যান তাঁর সমস্ত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে—তখন দেখতে কী অপূর্ব লাগে! আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না বাবা। কিন্তু মনে হয় যেন তিনি পরিতৃপ্ত নন। তাঁকে দেখে সবাই ভয় পায়। আমার কিন্তু একটুও ভয় লাগে না, বাবা। একটুও না।

: তারপর সেই কর্নেলদের বন্দি করে নিয়ে আসা হল লন্ডনে। শেষবারের মতো তাদের নিজেদের পরিজনের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়া হল। হঠাৎ আবার সেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠল। আবার সেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। আর ক্রমশ আবার তা মিলিয়ে গেল ঝড়ের শব্দের সঙ্গে অন্ধকারে। কর্নেলের তরুণী স্ত্রী এবার তার স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে নিজের চেহারার বিবর্ণতাকে গোপন করার প্রয়াস পেল।

: আজ সকালে তারা এসেছে।

এবার ছোট্ট এ্যাবি বিস্ফারিত চোখে বলল,

: হ্যাঁ, বাবা, এটা কি সাত্যি কাহিনী?

: হ্যাঁ মা।

: আঃ, কী ভালো! বল বাবা, এটা আরো সুন্দর। বল বাবা, তুমি বলে যাও। এ কী মা! তুমি কাঁদছ?

: না বাছা, তুমি কিছু ভেব না। ও কিছু নয়। আমি সেই হতভাগ্য পরিবারগুলোর কথা ভাবছিলাম।

: কিন্তু তুমি কেঁদো না, মা। দেখবে, এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে। গল্পের প্রথমে এমনই হয়। তারপর সবাই সুখি হয়। তুমি বলে যাও, বাবা। মায়ের কান্না থামুক।

: বাড়ি যেতে দেবার আগে ওদেরকে একবার দুর্গের চুড়োয় নিয়ে যাওয়া হল।

: আমাদের বাড়ি থেকে তো সেই দুর্গের চুড়ো দেখা যায়, বাবা।

BanglaInternet.com

: তারপর সেই দুর্গের চূড়োয় সামরিক আদালতে তাদের ঘন্টাব্যাপী বিচার হল। তারা বিচারে দোষী প্রমাণিত হল আর পরিণামে তাদের হত্যা করার আদেশ দেয়া হল।

: হত্যা! হ্যাঁ, বাবা?

: হ্যাঁ, হত্যা—বাবার কণ্ঠে এবার কেমন গম্ভীর হয়ে এল।

: আঃ, কী অলুক্ষণে! তুমি আবার কাঁদছ মা। না মা, তুমি কেঁদো না। দেখবে, এবার গল্পের ভালো অংশ শুরু হবে। হ্যাঁ বাবা, এবার খুব তাড়াতাড়ি বল তো। দেখছ না, মা কেমন অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

: হ্যাঁ মা, সত্যি। আমি মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছি বলেই হয়ত এমন হয়েছে।

: তাইতো বলছি বাবা, তুমি থেমো না।

: বেশ তাই হোক। সেই তিনজন কর্নেল..

: তুমি কি তাঁদের চেন, বাবা?

: হ্যাঁ, মা।

: আহা, আমিও যদি চিনতাম! আমি কর্নেলদের ভালোবাসি, বাবা। তাঁর কি আমাকে চুমু খেতে দেবে?

এবার জবাব দেওয়ার সময় কর্নেল মেফেয়ারের কণ্ঠ থরথর করে কেঁপে উঠল। বললেন, তাদের একজন নিশ্চয়ই দেবে, মা। নে মা, ওর কথা ভেবে আমার হাতে চুমু খা।

: ওঁদের তিনজনের জন্যেই আমি চুমু খেলাম, বাবা। ওঁরা নিশ্চয়ই আমাকে চুমু খেতে দিতেন। আমি বলতাম, আমার বাবাও একজন কর্নেল—ওঁদের মতোই সাহসী। আর তাহলে নিশ্চয়ই ওঁরা আমাকে না বলতে পারতেন না। তুমি কী বল, বাবা?

: হ্যাঁ মা, প্রভু জানেন, নিশ্চয়ই তারা দিত।

: না মা, তুমি ওভাবে আর কেঁদো না। এইতো বাবা গল্পের ভালোর দিকে এসে পড়লেন। বল, বাবা।

: সবাই দুঃখিত হল ওদের জন্য। সামরিক আদালতেরও সবাই। তারপর তারা সবাই মিলে সেই মহান জেনারেলের কাছে গেল। জানাল, তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে। তুই বুঝতে পারিস মা, এটাই তাদের কর্তব্য ছিল। আরো প্রার্থনা জানাল, ওদের যে-কোনো দুইজনকে মৃত্যু থেকে রেহাই দেয়া হোক। কারণ, সৈন্যবিভাগে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য একজনের মৃত্যুই যথেষ্ট কিন্তু জেনারেল অতি কঠোর লোক। তিনি সামরিক আদালতের সদস্যদের তিরস্কার করলেন। কারণ, তারা তাদের কর্তব্য শেষ করার পর এবং নিজেদের বিচার-বুদ্ধি মতে সিদ্ধান্তে পৌঁছার পর তার কর্তব্য সীমিত করার জন্য তাঁকে প্রভাবিত করতে চাইছে যা তাঁর সৈনিক-সুলভ মর্যাদার ওপর কলঙ্ক লেপন করবে। কিন্তু তারা জেনারেলকে জানাল যে, তারা তাঁর কাছ থেকে এমন বিশেষ কিছুই চাইছে না। কারণ, তারা যদি তাঁর জায়গায় থাকত এবং এই অসীম ক্ষমতা ও ক্ষমা করার অধিকারী হত, তাহলে তারা তাই করত। সব শুনে জেনারেল কী যেন ভাবলেন, স্থির হয়ে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ আর তাঁর চেহারার কাঠিন্য ক্রমশ কমে এল। তাদের অপেক্ষা করতে বলে জেনারেল তাঁর গোপন কক্ষে চলে গেলেন প্রার্থনার জন্য। তারপর ফিরে এসে বললেন, তাদের ভাগ্য তাদের নিজেদেরই ঠিক করতে হবে। এই ভাগ্য-পরীক্ষাতেই সব স্থির হবে। এবং তাদের মধ্যে দুজনকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেয়া হবে।

: তারা কি ঠিক করেছে, বাবা? কে, কে তাদের মধ্য থেকে মরবে?

: না, মা তারা অস্বীকার করেছে।

: তারা এটা করবে না, বাবা?

: না।

: কিন্তু কেন বাবা?

: কারণ, তাদের মধ্যে যে মারা যাবে তার মৃত্যু আত্মহত্যার সামিল হবে, মা। সত্যিকার খ্রিস্টানের জন্যে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ ও মহাপাপ। তাই তারা ওটা প্রত্যাহার করেছে। সামরিক আদলতের আদেশই পালিত হোক। তারা সবাই মৃত্যুর জন্য তৈরি।

: এর অর্থ কী, বাবা!

: তাদের সবাইকে গুলি করে মারা হবে, মা। বলতে বলতে ভারি শোনাল কর্নেলের কণ্ঠ।

আবার আকস্মাৎ সেই শব্দ।

বাতাসের শব্দ? নয়। সেই পায়ের শব্দ সৈনিকদের ভারি পদশব্দ। ক্রমশ নিকটতর হল। তারপর এক সময় দরজায় গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল।

: দরজা খুলুন।

: ওই দ্যাখ, বাবা, সৈন্যরা এসেছেন। আমি সৈন্যদের ভালোবাসি, বাবা, আমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে দাও ওঁদের।

তারপর ছোট্ট মেয়ে এ্যাবি লাফিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আর আনন্দে চিৎকার করে ওদেরকে ভেতরে আসতে বলল। সারি সারি সৈন্য ভেতরে প্রবেশ করে দাঁড়াল। সামরিক অফিসারটি কর্নেলকে কুর্নিশ করল আর হতভাগ্য কর্নেল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে অভিবাদন গ্রহণ করল। বেদনাহত কর্নেলের বিষণ্ন স্ত্রীও দাঁড়াল কর্নেলের পাশে। শঙ্কায় সাদা হয়ে গেছে ওর মুখমণ্ডল। শুধু ছোট্ট এ্যাবি আনন্দিত চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সমস্ত দৃশ্যটার দিকে। মা, মেয়ে আর পিতার দীর্ঘ আলিঙ্গনের পর ভারি কণ্ঠের আওয়াজ আবার ধ্বনিত হল : 'দুর্গের দিকে'। আর সমস্ত সৈন্যের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে কর্নেল মেফেয়ার চললেন সেই দুর্গের দিকে। যে দুর্গের চূড়ো দেখা যায় ওদের বাড়ি থেকে।

: মা, কী সুন্দর হল বল তো! আমি তোমাকে আগেই বলেছি না। ওই দেখ ওরা দুর্গের দিকে যাচ্ছে। বাবা সেই কর্নেলদের দেখতে পাবে।

: আয়, মা। আমার কাছে আয়, আয়। বলে দুহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়ল কর্নেলের স্ত্রী অবরুদ্ধ কান্নায়।

দুই

পরদিন আর্ত মা আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। ডাক্তার আর নার্সেরা তার বিছানার পাশে বসে তার অসুস্থতা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন ফিসফিসিয়ে। এ্যাবিকে কিন্তু ঘরের ভেতরে আসতে দেয়া হল না। তাকে জানানো হল, মায়ের খুব অসুখ। কাজেই সে যেন ভেতরে না এসে বাইরে খেলাধুলো করে। ছোট্ট মেয়ে সেই শীতে গায়ে একটা র‍্যাপার জড়িয়ে বাইরে পথে কিছুক্ষণ খেলে বেড়াল। তারপর এক সময় অতি অদ্ভুতভাবে মনে হল এ্যাবির, মায়ের এই দুঃসহ অসুস্থতার সময় বাবা কেন কিছু না জেনে পড়ে আছেন সেই দুর্গের চূড়োয়। এটা সত্যি অন্যায়। এটা হতে দেয়া উচিত নয়। যে-করেই হোক বাবাকে খবর দিতে হবে। সে নিজেই দেবে।

প্রায় একঘন্টা পরে জেনারেল মহোদয় সামরিক আদালতে সপারিষদ প্রবেশ করলেন।

BanglaInternet.com

টেবিলের পাশে তাঁর মুষ্টিবদ্ধ আঙুলগুলো রেখে সমস্ত চেহারায় ভয়ানক গম্ভীরতা এনে দাঁড়ালেন তিনি । জানালেন, এবার তিনি ব্যাপারটা শুনতে রাজি আছেন। মুখপাত্রটি জানাল, আমরা ওদেরকে অনেক বুঝিয়েছি, আমাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্যে, অনেক আবেদন নিবেদন করেছি ওদের কাছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আত্মপ্রবঞ্চনার পক্ষপাতী নয় তারা । তারা মরবে, তবু ধর্মকে কলুষিত করবে না।

ত্রাণকর্তার মুখমণ্ডল অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল। কিন্তু তবু কিছু উচ্চারিত হল না তাঁর কণ্ঠ থেকে । কিছুক্ষণ চিন্তায় মগ্ন থাকলেন তিনি। তারপর বললেন, 'না, ওদের সবাইকে মরতে হবে না। তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে নেয়া হবে।' সমস্ত আদালতের মধ্যে একটা কৃতজ্ঞতার আভা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবার বললেন জেনারেল, 'ওদেরকে ডেকে পাঠাও। দেয়ালের দিকে মুখ করে ওদেরকে পাশাপাশি দাঁড়াতে আদেশ দাও। আর তাদের হাতগুলো ক্রশ করে পেছন থেকে বেঁধে রাখ। সবশেষে আমাকে খবর দাও যাতে সে আবস্থায় ওদের আমি দেখতে পারি।'

সবাই যখন চলে গেল তখন জেনারেল বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রহরীকে ডেকে বললেন, 'যাও পথের ওপর যে শিশুকে প্রথম দেখবে তাকেই আমার কাছে নিয়ে এস।'

লোকটি কিন্তু বাইরে যেতে-না-যেতেই ফিরে এল। কুচিকুচি বরফের কণায় আচ্ছন্ন পোশাকে আবৃত ছোট্ট এ্যাবিকে এক হাতে ধরে নিয়ে। এ্যাবি সোজা চলে এল সেই রাষ্ট্রপতির কাছে যাঁর নাম শুনে দুনিয়ার জাঁদরেল ও ক্ষমতাবান লোকেরা ভয়ে কাঁপে। এ্যাবি সোজা তাঁর কোলে এসে বসল। বলল,

: আমি আপনাকে জানি। আপনি রাষ্ট্রপতি, জেনারেল। আমি কত দেখেছি আপনাকে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে। সবাই কিন্তু ভয় পায় আপনাকে দেখে। আমার কিন্তু একটুও ভয় করে না। কারণ আপনি আমার দিকে কোনোদিন সোজাসুজি তাকান নি। মনে পড়ে আপনার? আমার সেই লাল ফ্রকটা মনে পড়ে আপনার? ফ্রকটার নিচের দিকে নীল। একটুকরো নরম হাসি এবার রাষ্ট্রপতির মুখের কাঠিন্যকে কিছুটা কমিয়ে দিল। কিন্তু তবু তিনি বিজ্ঞ রাজনীতিকের মতোই তার উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন,

: কেন, আমি তো..

: আমাদের বাড়ির পাশে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের বাড়ি, মনে পড়ে না?

: আমার সত্যি লজ্জিত হওয়া উচিত। তুমি বুঝতে পারছ না, মা...

: এবার ছোট্ট এ্যাবি মিষ্টি তিরস্কার করে জেনারেলকে বাধা দিল তাঁর কথায়।

: আচ্ছা, তাহলে আপনার কিছুই মনে পড়ছে না। কিন্তু আমি তো কিছুই ভুলে যাই নি।

: আমি সত্যি লজ্জিত, মা। আমি তোমাকে কথা দিলাম। এবার নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। আমাকে তোমার বন্ধু বলে নেবে আজকের জন্যে, চিরদিনের জন্যে।

: নিশ্চয়ই আমি ক্ষমা করব যদিও আমি বুঝতে পারি না, কী করে আপনি সব ভুলে গেলেন। আপনি নিশ্চয়ই খুব ভুলোমন। আমারও কিন্তু মাঝে মাঝে ভুলোমন হয়ে পড়ে। আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ক্ষমা করতে পারব। কারণ, আপনি ভালো। আর দয়ালু। আপনি আমাকে আরো কাছে টেনে নিচ্ছেন না কেন? বাবা যেমনি নেয়। বাইরে এখন কী প্রচণ্ড শীত।

: মা লক্ষ্মী আমার, তোমাকে নিশ্চয়ই আমি আমার হৃদয়ের কাছে টেনে নেব। কিন্তু তুমি আমার ছোট্ট বন্ধু হবে তো, অনেক দিনের জন্য? জেনারেলের কণ্ঠ এবার কেমন ভারি হয়ে এল। এ্যাবিকে কাছে টেনে নিলেন আরো। বললেন, তোকে দেখে আমার নিজের ছোট্ট

মেয়ের কথা মনে পড়ছে। অবশ্য এতদিনে সে আর ছোট্টটি থাকত না। কিন্তু সে তোর মতোই মিষ্টি, প্রিয় আর আদরের ছিল। তোর মতোই সুন্দরী ছিল। তোর মতো ছোট্ট পরীর রূপ। শত্রু-মিত্র সবার ওপর প্রভাবশালী বিশ্ববিজয়ী আকর্ষণ ছিল তার। সে আমার দু-হাতের ভেতর শুয়ে থাকত ঠিক তোর মতো নিবিড় হয়ে। আমার হৃদয়কে আনন্দে শান্তিতে আপ্লুত করে দিত যেমন এখন তোকে পেয়ে আমার মন তেমনি এক আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেছে। আমরা বন্ধু ছিলাম, খেলার সাথি ছিলাম । কত আগেকার ছিল এসব। কত আগেকার ঘটনা! এখন কোথায়, কোন স্বর্গে সব হারিয়ে গেছে। কিন্তু এতদিন পরে আবার তুই সব ফিরিয়ে এনেছিস, মা। আয় ছোট্ট মা, তুই আমার আশীর্বাদ নে।

: তুমি কি সত্যি তাকে খুব ভালোবাসতে? খুব, খুব বেশি?

: হ্যাঁ, মা তুই বুঝতে পাচ্ছিস না? সে আমাকে হুকুম দিত আর আমি মাথা পেতে নিতাম। পালন করতাম তার আদেশ।

: আশ্চর্য, তুমি কী সুন্দর! তুমি আমাকে চুমু খাবে না?

: নিশ্চয়ই। আনন্দের সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোকে চুমু খাব, মা। এই নে, এটা তোর জন্যে। আর এটা ওর জন্যে। তুই আমাকে অনুরোধ করেছিস, মা। কেন তুই আমাকে হুকুম দিলি নে, আমার সেই মায়ের মতো। তাহলে আমি নিশ্চয়ই সে হুকুক পালন করতাম।

: ছোট্ট মেয়ে এ্যাবি শুনে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। একটু পরেই তার কানে ভেসে এল সৈন্যদের সমবেত পায়ের শব্দ।

: সৈন্য! সৈন্য, সৈন্যরা সব আসছে! আমি ওদেরকে দেখব!

: অবশ্যই দেখবি মা। কিন্তু এক মুহূর্ত অপেক্ষা কর। আমি তোর জন্য একটা জিনিস এনেছি, এটা তুই নে।

সহসা একজন অফিসার ঘরে প্রবেশ করল। ঈষৎ মাথা নত করে বলল, ধর্মাবতার, ওরা এসেছে। তারপর আবার মাথা একটু নত করে চলে গেল।

রাষ্ট্রপতি এ্যাবিকে ছোট্ট তিনটি সিল-করা বাক্স দিলেন। এর মধ্যে দুটো সাদা আর একটি টকটকে লাল। আর এ-লালটি কর্নেলদের মধ্যে যে পাবে তাকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

: আহা, কী সুন্দর টকটকে লাল! এগুলো কি আমার জন্য?

: না মা, এগুলো অন্যের জন্যে। ওই পর্দার কোণটা সরিয়ে ফেল, মা। পর্দার ওপারে একটা ছোট্ট দরজা আছে। দরজার ভেতরে চলে যা—দেখতে পাবি, তিনটি লোক দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হাত তাদের পেছন দিকে বাঁধা । কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই একটি হাতের মুঠো খোলা—ঠিক ছোট্ট পেয়ালার মতো। এগুলির একটি করে এক এক হাতে ফেলে দিয়ে তুই আমার কাছে ফিরে চলে আয়, মা।

রাষ্ট্রপতিকে একা ফেলে মুহূর্তে এ্যাবি সেই পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভক্তিআনত স্বগতোক্তির মতো জেনারেল নিজে নিজেই এবার বলতে লাগলেন,

: চরম অনিশ্চয়তা আর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে তাঁর গোপন চির-শুভ-ইচ্ছের মতো এই চিন্তা আমার মাথার মধ্যে এল তাদের জন্যে, যারা তাঁর ওপর আস্থাবান নয় কিন্তু তাঁর সাহায্য চায়। তিনি জানেন, কার মৃত্যু হবে এবং এজন্যই তাঁর ছোট্ট প্রতিনিধি, নিষ্পাপ দূতকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর ইচ্ছে পূরণের জন্যে। অন্যের ভুল হতে পারে কিন্তু তাঁর ভুল হবে না। তাঁর ভুল হয় না। আশ্চর্য, অচিন্ত্যনীয় তাঁর পথ। সে-পথ জ্ঞানের । ধন্য হোক, তাঁর পবিত্র নাম।

ছোট্ট নিষ্পাপ পরীর মতো এ্যাবি পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে মুহূর্তের জন্যে

BanglaInternet.com

দাঁড়াল। খুব সতর্ক হয়ে, অদম্য কৌতূহল নিয়ে সে বন্দি সৈনিকদের স্থাণুর মতো শরীরগুলোর দিকে তাকাল। আর সহসা তার সমস্ত মুখমণ্ডল এক অপূর্ব আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দে অধীর হয়ে সে নিজের মনেই বলে উঠল, কী আশ্চর্য, এই তো ওদের মধ্যে বাবা রয়েছে! ওই তো ওর পিঠ। সবচে সুন্দর সেই পিঠ। আনন্দে সে এগিয়ে গেল বাবার দিকে। সিল-করা বাক্সগুলো খোলা হাতগুলোতে দিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাল আর হাস্যোজ্জ্বল আনন্দে চিৎকার করে উঠল,

: বাবা, বাবা, দেখ তোমাকে কী দিয়েছি। এটা আমি তোমার জন্যে এনেছি।

কর্নেল এবার নিজের হাতের সেই ভয়াবহ ছোট্ট উপহারটির দিকে তাকালেন। তারপর তার ছোট্ট নিষ্পাপ হত্যাকারীকে টেনে আনলেন নিজের বুকের মধ্যে। ভালোবাসায়, শঙ্কায় আর সহানুভূতিতে তিনি কেঁপে উঠলেন। সমস্ত সৈনিক, অফিসার, মুক্ত কয়েদি—সবাই অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ এই করুণ মর্মান্তিক দৃশ্যের পরিব্যাপ্তি দেখে। তাদের হৃদয় এই সকরুণ পরিস্থিতিতে সহানুভূতিতে ভরে এল। অশ্রু ভারাক্রান্ত হল তাদের চোখ। কাঁদল সবাই। কিছুক্ষণের জন্যে একটা গভীর অবিস্মরণীয় ভক্তিপ্লুত স্তব্ধতা নেমে এল সেখানে। তারপর প্রহরারত অফিসারটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে গেল বন্দি কর্নেলের দিকে। তার কাঁধে হাত রেখে বলল,

: শোক আমাকে আচ্ছন্ন করেছে সত্যি কিন্তু আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে। আমাকে যে আদেশ....

: আদেশ? কিসের আদেশ! বলল ছোট্ট এ্যাবি।

: ওঁকে সরিয়ে নিতে হবে আমাকে। সত্যি আমি দুঃখিত।

: ওঁকে সরিয়ে নিতে হবে? কোথায়?

: হায় খোদা! ওকে সরাতে হবে... । সরাতে হবে দুর্গের ওপাশে।

: না না, সে তুমি পারবে না। এবার চিৎকার করে উঠল এ্যাবি। আমার মা অত্যন্ত পীড়িত—বাবাকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব।

এ্যাবি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বাবার পিঠের ওপর চড়ে বসে দুহাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। বাবাকে নিবিড়ভাবে নিজের দিক টেনে বলল, আমি তৈরি, বাবা, চল এবার আমরা যাই।

: না মা, আমাকে যেতে দেবে না। আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে হবে।

ছোট্ট এ্যাবি এবার বাবার পিঠ থেকে লাফিয়ে নিচে নামল। নিজের চারদিকে তাকাল। তারপর দৌড়ে সেই অফিসারের সামনে গিয়ে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে তার ছোট্ট তুলতুলে পা দুটো মেঝেতে বারবার আঘাত করে চিৎকার করে বলে উঠল,

: তোমাকে আমি বলেছি, আমার মায়ের অসুখ। তোমার সে কথা শোনা উচিত। বাবাকে তোমার যেতে দিতেই হবে।

: আহা, ছোট্ট শিশু! হায় খোদা, যদি পারতাম! কিন্তু ওঁকে যে আমায় নিয়ে যেতেই হবে।

তারপর অফিসার পাহারারত সৈন্যদের আদেশ দিলেন, 'এটেনশন'। বিদ্যুৎ-এর মতো এ্যাবি সেখান থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার ফিরে এল মুহূর্তে। নিজের ছোট হাত দিয়ে রাষ্ট্রপতি জেনারেলকে জোর করে টেনে নিয়ে এল সেখানে। আর এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে উপস্থিত সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াল। অফিসাররা জেনারেলকে অভিবাদন জানালেন আর সৈন্যেরা রাইফেল নামিয়ে কুর্নিশ করল। এ্যাবি এবার জেনারেলের দিকে তাকিয়ে

বলল,

: তুমি এদেরকে থামাও! আমার মা অত্যন্ত পীড়িত। বাবাকে ছাড়া সে এক মুহূর্তেও থাকতে পারে না। আমি সে কথা ওদেরকে বলেছি, কিন্তু ওরা আমার কথা শুনছে না। ওরা বাবাকে নিয়ে যেতে চায়।

জেনারেল হঠাৎ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার বাবা। ওই কি তোমার বাবা?

: কেন? নিশ্চয়ই। দেখছ না, বাবা বলেই না সবচে সুন্দর লাল বাক্সটি আমি ওকে দিয়েছি।

একটা বেদনার্ত অনুভূতি জেনারেলের সমস্ত মুখমণ্ডলে রেখায়িত হয়ে উঠল। তিনি বললেন,

: হা প্রভু! এ কী আমি করেছি! মানুষের দ্বারা ঘটতে পারে, এমন নিষ্ঠুরতম কাজ আমি করেছি। নিশ্চয়ই শয়তান আমাকে পরিচালিত করেছে। প্রভু, আমার কী হবে! আমি কী করব?

এ্যাবি এবার অধৈর্য হয়ে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল : কেন, তুমি ওদেরকে বল না বাবাকে ছেড়ে দিতে।

তারপরই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল—

: বাবাকে ছেড়ে দিতে বল। তুমি না একটু আগে বলেছিলে, তোমাকে হুকুম দিতে? আর আমি এখন যা করতে বলছি, তা তুমি করছ না!

একটা নরম প্রীতির আলো সহসা সেই বৃদ্ধ বিক্ষত চেহারায় প্রথম উষার স্বর্ণাভার মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জেনারেল এবার ছোট এ্যাবির মাথার ওপর হাত রেখে বললেন, প্রভুকে ধন্যবাদ, এই আসন্ন দুর্ঘটনা থেকে—অচিন্ত্যনীয় প্রতিজ্ঞা থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্যে। আয় মা, তার ইচ্ছায় তুই আমাকে সব বলে দিয়েছিস। তুই অনন্যা, মা।

তারপর অফিসারদের বললেন, তোমরা এর আদেশ পালন কর। বন্দির অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে। ওকে মুক্ত করে দাও।

রচনাকাল : ১৯০১

BanglaInternet.com

একটি প্রেমকথা

মিশকালো আঁধারে মৃত দানবের মতো নিশ্চল পড়ে আছে ক্লুগেনস্টিনের সামন্ত রাজার প্রাসাদ। সময়টা ১২২২ সালের শেষাশেষি। শুধু একটি প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলছে দুর্গপ্রাসাদের সবচাইতে উঁচু টাওয়ারে। বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, কোনো গোপন পরামর্শ চলছে সেখানে। একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চিন্তার রাজ্যে ডুবে আছেন বুড়ো সামন্ত। চোখ-মুখের বলিরেখাও লুকোতে পারে নি কঠোরতার ছাপকে। তবু গলার স্বরকে যথাসম্ভব কোমল করে বললেন তিনি, 'মা রে!'

জবাব দিল আগাগোড়া নাইটের পোশাকে মোড়া এক সুদর্শন যুবক, 'বল, বাবা!'

'মা, আমার। সারা জীবন ধরে যে রহস্যের কথা ভাবছিস সেটা প্রকাশ করবার সময় আজ এসেছে। সবকিছুই খুলে বলছি তোকে, ভালো করে শোন। ব্রাডেন বার্গের ডিউক হচ্ছেন আমার ভাই—নাম উলরিচ। আমাদের বাবা মৃত্যুশয্যায় বলে যান যে, উলরিচের যদি ছেলে না হয়, তাহলে আমার ছেলে না হয়ে শুধু মেয়ে হলে উলরিচের মেয়েই হবে সিংহাসনের দাবিদার—যদি সে পূতচরিত্রা হয়। সে ভ্রষ্টা হলে আর আমার মেয়ে চরিত্রবতী হলে সিংহাসনের দাবি তার ওপর বর্তাবে। কাজেই আমরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে খোদার কাছে আকুল প্রার্থনা জানাতে থাকলাম একটা ছেলের জন্য। কিন্তু বিফলে গেল সবই, ছেলের বদলে হলি তুই। হতাশায় ভেঙে পড়লাম আমি। সব আশাই বানচাল হয়ে গেল। হাতের মুঠোয় এসেও ফস্কে গেল সিংহাসন। বিয়ের পাঁচ বছর পরেও উলরিচের ছেলে-মেয়ে কিছু না হওয়ায় আরো বেশি করে আশা করছিলাম আমি।

কিন্তু সম্পূর্ণ আশা ছেড়ে দিতে আমি রাজি ছিলাম না। সিংহাসন আমার চাই-ই। একটা মতলবও খেলে গেল মাথায়। তুই যখন এলি তখন মাঝরাত। সূতিকাঘরে ছিল মাত্র আটজন—দাই, নার্স আর ছ-জন চাকরানি। একঘণ্টার ভেতরই ফাঁসি কাঠে ঝুলে গেল আট-আটটি মাথা। পরদিন সকালে সারা জমিদার বাড়িতে রটে গেল সুখবর ক্লুগেনিস্টনের ছেলে হয়েছে—ব্রাডেনবার্গের উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব হয়েছে। একটি কাক-চিলও জানতে পারে নি আসল রহস্য। শৈশবে তোর দেখা-শোনা করেছে তোর মায়ের আপন বোন—একা। ভয়ের কোনো কারণ রইল না আর।

'তোর দশবছর বয়েসে এক মেয়ে হয় উলরিচের। দুঃখ হল ঠিকই। কিন্তু আশা করে রইলাম যে, খোদা মেহেরবানি করে হাম বা আর কোনো অসুখ দিয়ে আমাদের পথকে নিষ্কণ্টক করবে। কিন্তু এবারেও মুখ তুলে চাইলেন না খোদা। ফলে দিনকে দিন বাড়তেই লাগল পোড়ামুখি মেয়েটা। তবে ভয় নেই আমাদের। কেন, আমাদের কি ছেলে হয় নি—আমাদের চোখের মণি কনরাড? ভাবি ডিউক? কী বলিস, বাছা—আটাশ বছরের রমণী হলেও কনরাড বলেই লোকে চেনে তোকে! হা! হা! হা!

'তোকে আজ সব কথা বলতে হচ্ছে এজন্য যে, বয়েসের ভারে আমার ভাই নুয়ে পড়েছে। রাজ্য-শাসনের গুরুদায়িত্ব তার বুড়ো শরীরে আর সইছে না। সে চাচ্ছে, নামে না হলেও এখন থেকে তুইই ডিইকের কাজ বুঝে নিবি। তোর যাত্রার সব ব্যবস্থাই ঠিক হয়ে গেছে, আজ রাতেই রাওয়ানা হতে হবে।

এবারে ভালো করে শোন। আমার প্রত্যেকটি কথা মনে রাখতে হবে। একটা পুরনো আইন আছে যে, প্রজাদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষেকের আগে কোনো নারী যদি ডিউকের সিংহাসনে বসে তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ মরতে হবে। মনে থাকে যেন একথা। বিনয়ের ভান করে সিংহাসনের সামনে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে রায় দিবি—যদ্দিন না আনুষ্ঠানিক অভিষেকটা হয়ে যায়। তুই যে মেয়ে—একথা ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কা তত নেই। তবু দুনিয়াটা বড় বিশ্বাসঘাতক। কাউকেই বিশ্বাস করা নিরাপদ হবে না।'

'বাবা গো! তাহলে এ-জন্যেই জীবনটা আমার মিছে হয়ে গেছে—নির্দোষ চাচাতো বোনটাকে ঠকাবার জন্যে? আমাকে মাফ কর, বাবা। তোমার সন্তানকে মাফ কর।'

'কী আহাম্মক! এই বুঝি আমার পুরস্কার? এ-জন্যেই কি এত বছর ধরে মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে তোর ভবিষ্যতের ভরসা ভেবেছি আমি? এসব ন্যাকামি আর প্যাঁচ-প্যাঁচানি আমার সহ্য হচ্ছে না, বুঝলি? এক্ষুনি রওয়ানা দে, আর খবরদার, আমার মতলব যেন কোনো মতেই ফাঁস হয়ে না যায়।'

বৃথাই কাকুতি-মিনতি আর কান্নাকাটি করল কোমলমতী যুবতী। কিন্তু তাতে গলবার মতো নরম নয় ক্লুগেনস্টিনের বুড়ো জমিদারের মন। কাজেই চোখের জল মুছে কন্যা দেখল, প্রাসাদের বিরাট সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল তার পিঠের ওপরে। সশস্ত্রী-রক্ষী পরিবৃত হয়ে সানুচর সে এগিয়ে চলল নিকষ কালো রাতের বুক চিরে।।

ক্লুগেনস্টিনের দুর্গপ্রাসাদে আরো কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল বুড়ো ব্যারন। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল :

'আমাদের মতলব শিগিরই হাসিল হবে বলে মনে হচ্ছে। সুদর্শন চতুর কাউন্ট ডেট্‌জিনকে তার শয়তানি কাজ দিয়ে ভাইয়ের মেয়ে কনস্ট্যান্সের কাছে পাঠিয়েছি পুরো তিন মাস আগে। সে ব্যর্থ হলে অবিশ্যি পুরোপুরি নিরাপদ নই আমরা। কিন্তু ব্যর্থ না হলে কোনো কারণে আমাদের মেয়ে যদি ডিউক নাও হতে পারে, তবু ডাচেস হওয়া তার কেউ আটকাতে পারবে না!'

'আমার মন কেমন কেমন করছে। তবু যেন সবকিছু ভালোয় ভালোয় উতরোয়।'

'আবার মেয়েলি প্যাঁচ-প্যাঁচানি। প্যাঁচার মতো সব অলক্ষুণে কথা। যাও ঘুমোও গে, আর ব্রাডেনবার্গের স্বপ্ন দেখ।'

এর ছ-দিন পরের কথা। আলোকসজ্জা, সামরিক কুচকাওয়াজ আর প্রজাদের উল্লাসধ্বনিতে জমজমাট হয়ে উঠল করদ-রাজ্য ব্রাডেনবার্গের রাজধানী। সিংহাসনের ভাবি উত্তরাধিকারী যুবক কনরাড এসেছে। বুড়ো ডিউকের মনও উদ্বেল হয়ে ওঠে খুশিতে। কনরাডের সুদর্শন অভিজাত চেহারা আর কথাবার্তা ও চালচলনের সৌকুমার্য তাঁকে অভিভূত করেছে। প্রাসাদের অতিকায় কক্ষগুলোতে গিজগিজ করছে অভিজাতরা ; এ-উৎসবমুখরতায় অস্বস্তি আর আতঙ্ক দূর হয়ে যুবরাজের মনেও নেমে এসেছে তৃপ্তি ও প্রশান্তি।

কিন্তু প্রাসাদের এক অবজ্ঞাত কোণে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছিল। গবাক্ষে দাঁড়িয়ে ডিউকের একমাত্র সন্তান—কন্যা কনস্ট্যান্স। রক্তাভ আর ফোলা চোখে অবিরাম কান্নার চিহ্ন সুস্পষ্ট। আবারো কান্নায় ভেঙে পড়ল সে, অস্ফুটে বলল :

'শয়তান ডেটজিনটা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। গোড়ায় যদিও বিশ্বাস করতে পারি নি, কিন্তু এখন সত্যি এ-কথা। অথচ একেই ভালোবেসেছিলাম আমি। বাবা তার সাথে বিয়েতে সায় দেবেন না জেনেও শয়তানটাকে ভালোবেসেছিলাম আমি। এখন আমি ঘৃণা করি ওকে—সারা

দেহমন দিয়ে ঘৃণা করি। কী হবে আমার, ওহ! আমার কী হবে। সর্বনাশ হয়েছে আমার। আমি পাগল হয়ে যাব!'

ইতিমধ্যে কয়টি মাস কেটে গেছে। কনরাডের সুশাসন, বিচার, বিজ্ঞতা, ক্ষমাপরায়ণতা আর বিনয়ী স্বভাবের খ্যাতি রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়েছে লোকের মুখে মুখে। অল্প দিনের ভেতরেই বুড়ো ডিউক রাজ্যের ভার পুরোপুরি তার হাতে ছেড়ে দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে যুবরাজ যে রাজকীয় অনুজ্ঞা দিত দূরে বসে তা শুনে তৃপ্তিতে আর গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠত। মনে হতে পারে যে, কনরাডের মতো সকলের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর প্রশংসাভাজন যে, সে সুখি না-হয়েই পারে না। কিন্তু সুখি সে হয় নি। গভীর বিষাদের সাথে লক্ষ করল সে, রাজকুমারী কনস্ট্যান্স তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। দুনিয়ার আর যে-কোনো মানুষের ভালোবাসাই তার কাছে পরম প্রিয়। কিন্তু এতে যে সর্বনাশের বীজ নিহিত রয়েছে! আরো উদ্বেগের কথা, কন্যার মনে ভাব-সাব লক্ষ করে বুড়ো ডিউকও খুশিই হয়েছেন। এমন কি বিয়ের স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছেন তিনি। রাজকুমারীর মুখের বিষাদের ছায়া দিনকে দিন মিলিয়ে যাচ্ছে! আশা আর সম্ভাবনা দিনকে দিন মূর্ত হচ্ছে তার দু-চোখে। এতকালের ব্যথালাঞ্ছিত গৌর-বদনে হাসির ছটাও খেলে যায় মাঝে মাঝে।

নিজের ওপরই রাগ ধরে যায় কনরাডের। প্রাসাদে নতুন এসে কারো সঙ্গ প্রবৃত্তিগতভাবেই চেয়েছিল সে। সহানুভূতির দরকার ছিল তার, কিন্তু নারী ছাড়া আর কে দিতে পারে অবদমিত নারী-হৃদয়ের কাম্য সহানুভূতি? কিন্তু এ কী সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে। রাজকুমারীকে এড়িয়ে চলতে লাগল। কিন্তু অবস্থাটা উল্টো দিকেই গড়াল বরং। ছায়ার মতো তার পেছন পেছন ফিরতে লাগল রাজকুমারী। দিন-রাত্রির যে-কোনো সময় প্রাসাদের যে-কোনো এলাকাতেই সে যাক না কেন, যেন কোনো রহস্য বলে সেখানে হাজির থাকবে রাজকন্যা।

এ-অবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না। সকলের মুখে মুখে ফিরছে কানাঘুষো, অস্থির হয়ে উঠছেন ডিউক। দুশ্চিন্তায়, আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে উঠল। একদিন বসবার খাসঘর থেকে বেরিয়ে আসছে সে, এমন সময় কনস্ট্যান্স এসে সামনে দাঁড়াল। আর দুহাত জড়িয়ে ধরে বলল :

'কেন এমন করে আমাকে এড়িয়ে চলছ তুমি? কেন, কী করেছি আমি, কী বলেছি তোমাকে? অথচ একদিন তুমি ভালোবাসতে আমাকে? আমি অনেক যন্ত্রণা সয়েছি, কনরাড! আমাকে ঘৃণা কর না। একটু করুণাও হয় না তোমার? আমার কথা শুনতেই হবে তোমাকে, নইলে বুক ফেটে মরে যাব আমি। তোমাকে আমি ভালোবাসি, কনরাড। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। ইচ্ছে হলে ঘৃণা করতে পার তুমি, কিন্তু সে-কথা মুখ ফুটে বলতে হবে তোমাকে।'

পাথরের মতো নীরব দাঁড়িয়ে থাকে কনরাড। কিন্তু তার নীরবতার অর্থ করা হল উল্টো। একটা উদ্দাম আনন্দ মূর্ত হয়ে উঠল কনস্ট্যান্সের চোখে-মুখে। দুহাতে কনরাডকে জড়িয়ে ধরে সে বলল :

'কেমন, এবারে হল তো? জানি, আমাকে ভালো না-বেসে কিছুতেই পারবে না তুমি। প্রিয়তম আমার, আমার প্রিয়তম কনরাড!'

শব্দ করে গুঙিয়ে ওঠে কনরাড। একটা অব্যক্ত, বুক-ফাটা বেদনা ধীরে ধীরে ছায়া ফেলে যায় তার চোখ-মুখে। সজোরে ওকে সরিয়ে দিয়ে বলল সে :

'তুমি যা চাইছ, সেটা হতে পারে না—বরাবরের জন্যেই অসম্ভব সেটা!' আতঙ্কে ছুটে

পালায় সে, যেন এইমাত্র কাউকে খুন করে ধরা পড়ার ভয়ে পালাচ্ছে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাজকুমারী মুহূর্তখানেক। তারপর ফুলে ফুলে তার সে কী কান্না। এদিকে নিজের ঘরে কাঁদছিল কনরাডও। হতাশায় ভেঙে পড়েছে দুজনেই। সর্বনাশ হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাদের। নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কনস্ট্যান্স। অস্ফুটে বলল, 'আমার ভালোবাসাকে ঘৃণা করে সে। অথচ আমি ভাবছিলাম, ওর পাষাণ মন গলতে শুরু করেছে। নিষ্ঠুর। ঘৃণা করি ওকে আমি! কুকুরের মতো সরিয়ে দিল আমাকে!'

কালের চাকা গড়িয়ে চলে। রাজকুমারীর মুখে যে হাসির ছটা খেলতে শুরু করেছিল আবার মিলিয়ে গেল তা। বর্ষার মেঘের মতো ঘন কালো সে মুখ। বিশেষ করে কনরাডের আশপাশে আর দেখা যায় না তাকে। সেই সঙ্গে ভেঙে পড়ে ডিউকের বুকও। এদিকে রাজ্যশাসনে আরো বেশি করে মন দিল কনরাড। স্বাভাবিক রঙ ফিরে এল চেহারায় আর দুই আয়ত চোখে। তার সুশাসন ও বিজ্ঞতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল আরো বেশি বেশি করে।

কিছুদিন ধরে এক আজব কানাঘুষো চলছিল প্রাসাদের আনাচে-কানাচে। এ-কানাঘুষো ক্রমেই জোরদার আর ব্যাপক হতে হতে শেষে শহরময়, দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। পরচর্চা মজলিশের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল এ-গুজব 'লেডি কনস্ট্যান্স সন্তানের মা হয়েছেন।'

খবরটা ক্লুগেনস্টিনের দুর্গ-প্রাসাদেও পৌঁছুল। দুর্গের মালিক পালক-দেয়া শিরস্ত্রাণটা বার দুই নেড়ে-চেড়ে চিৎকার করে উঠলেন :

'ডিউক কনরাড—জিন্দাবাদ! আজ থেকে তার মুকুট নিষ্কণ্টক। শয়তান ভেটজিনটা তাহলে আদেশ পালন করেছে? এ-পুরস্কার সে পাবে আবশ্যই!'

সুখবরটা আরো বেশি করে প্রচার করে দিল সে। পরে দু-দিন ধরে তার টাকায় সারা জমিদারি জুড়ে চলল নাচগান, আলোকসজ্জা, ভোজ আর হাসির হররা।

বিচারসভা বসেছে। ব্রাডেনবার্গ প্রাসাদের বিচারকক্ষে জড় হয়েছেন রাজ্যের প্রধান প্রধান লর্ড ও ব্যারনরা। দর্শকের ভিড়ে তিল ধরবার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। রক্তিম পোশাকে কনরাড বসেছে প্রধানমন্ত্রীর আসনে। দু-পাশে প্রধান প্রধান বিচারকগণ। বুড়ো ডিউক কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর মেয়ের বিচার হবে বিনা পক্ষপাতিত্বে। তারপর থেকেই ভাঙা বুককে সঙ্গী করে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। দিন তাঁর ঘনিয়ে এসেছে। অনেক অনুনয় করেছে হতভাগ্য কনরাড—আপন চাচাতো বোনের বিচার যেন তাকে দিয়ে না হয়। কিন্তু কোনো অনুনয়ই টিকল না তার।

বিরাট এই একঘর জনতার ভেতর তার মনই বোধ করি সবচাইতে বিষণ্ন। সবচাইতে উৎফুল্ল তার পিতার। কন্যা 'কনরাডের' অলক্ষ্যে সে এসে বসেছে অভিজাতদের দলে। আসন্ন সৌভাগ্যের কল্পনা তার হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে দিয়ে গেছে অনেক আগেই।

ঘোষকদের ঘোষণা ও অন্যসব আনুষ্ঠানিকতার পর বৃদ্ধ প্রধান বিচারপতি হাঁকলেন, 'বন্দিনী, উঠে দাঁড়াও!'

হতভাগ্য রাজকুমারী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ঘোমটা অনাবৃত করেই দাঁড়িয়ে রইল অগুনতি দর্শকের চোখের সামনে।

প্রধান বিচারপতি আবারো বললেন, 'পরম সম্মানীয়া রাজকুমারী, রাজ্যের প্রধান প্রধান বিচারকের সামনে অভিযোগ—এমন কি প্রমাণও করা হয়েছে যে, পবিত্র বিবাহ-বন্ধন ছাড়াই আপনি সন্তানের জননী হয়েছেন। আমাদের প্রাচীন আইন অনুসারে এর শাস্তি মৃত্যু। তবে এর মাত্র একটি ব্যতিক্রম আছে, সেটাই এখন মহামহিম অস্থায়ী ডিউক বলবেন। মনোযোগ

BanglaInternet.com

দিয়ে অনুধাবন করুন।'

যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তরবারিতে হাত দিল কনরাড। কিন্তু এ-মুহূর্তেই তার নারীহৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠল। চোখে নেমে এল অশ্রুধারা। কথা বলবার জন্যে মুখ খুলল সে। কিন্তু প্রধান বিচারপতি বাধা দিল :

'ওখানে নয়, মহামানব। ওখানে নয়। ডিউকের সিংহাসনে না-বসে রাজবংশের কারো বিচার করা বে-আইনি?'

একটা হিমবাহ যেন বয়ে গেল কনরাডের অভিষেক হয় নি এখনো—সিংহাসনকে কি সে অপবিত্র করবে! আতঙ্কে অস্বস্তিতে বিবর্ণ হয়ে গেল সে। কিন্তু উপায় কী? আদালতসুদ্ধ লোকের চোখ তার ওপর। আর বেশি ইতস্তত করলে তারা সন্দেহ করবে। সিংহাসনে উঠে বসল সে। তারপর তরবারি সামনের দিকে প্রসারিত করে বলল :

'বন্দিনী! ব্রান্ডেনবার্গের ডিউক লর্ড উলরিচের নাম নিয়ে আমি আমার অপ্রিয় কর্তব্য সমাপনে ব্রতী হয়েছি। ভালো করে শোন। দেশের পুরনো আইন-অনুযায়ী নিজ দুষ্কর্মের সাথিকে ঘাতকের হাতে সমর্পণ করতে না-পারলে তোমার মৃত্যুদণ্ড অপরিহার্য। এ-সুযোগ হারিও না—সময় থাকতে আত্মরক্ষা কর। তোমার সন্তানের পিতার নাম প্রকাশ কর!'

সারা আদালতে নেমে এল প্রগাঢ় নীরবতা—এত নীরব যে, প্রত্যেকেই শুনতে পাচ্ছে নিজ নিজ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রাজকুমারী। ঘৃণার অভিব্যক্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে তার চোখে-মুখে। তারপর কনরাডের দিকে আঙুল তুলে বলল :

'আমার সন্তানের জনক তুমি!'

মৃত্যুর মতোই তুহিন শীতল এক আতঙ্ক ছেঁকে ধরল কনরাডের বুক। তার আর বাঁচার পথ কই? এ-অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণ করতে হলে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আর অভিষেক ছাড়া নারীর সিংহাসনে বসার অর্থও তো অবধারিত মৃত্যু। প্রায় একই সাথে সে ও তার পিতা মূর্ছিত হয়ে পড়ল মাটিতে।

এ-কাহিনীর শেষ এ-বই বা আর কোথাও পাওয়া যাবে না কখনো। প্রকৃতপক্ষে, ঘটনাক্রমে নায়ককে (বা নায়িকাকে) এমন অবস্থায় এনে ফেলেছি যে বাঁচবার পথ খুঁজে পাওয়া গেল না। সম্ভব হলে আত্মরক্ষা সে করুক, ততক্ষণে আমি সরে পড়ি। গোড়াতে ভেবেছিলাম, সমস্যার সমাধান কঠিন হবে না। কিন্তু এখন সে মত বদলেছে।

[illegible] : ১৯৭৬

দশলক্ষ পাউন্ডের নোট

আমার বয়স তখন সাতাশ বছর। সানফ্রান্সিসকোর এক খনির দালালের কেরানির কাজ করতাম আমি। শেয়ার লেন-দেনের কাজে আমার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও সুখ্যাতি ছাড়া জগতে নির্ভর করবার মতো আর কোনো সম্বল ছিল না আমার। ভাগ্যের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে এই পরিস্থিতিই আমার সহায়ক হয়েছিল এবং তার পরিণতি আমি হাসিমুখেই বরণ করে নিয়েছিলাম।

শনিবার দিন দুপুরের খাওয়ার পর আমার আর কোনো কাজ থাকত না। এই সময়টায় ছোট্ট একটা নৌকোয় পাল তুলে দিয়ে আমি সাগরে পাড়ি জমাতাম। একদিন সাহস করে একটু দূরেই গেলাম এবং গভীর সাগরের এলাকায় গিয়ে পড়লাম। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে আমি যখন উদ্ধার পাবার সমস্ত আসা-ভরসা ত্যাগ করেছি তখন লন্ডনগামী একটা জাহাজ আমাকে তুলে নিল। সে এক দীর্ঘ এবং ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রযাত্রা। তারা আমাকে একটা সাধারণ নাবিকের কাজ দিয়েছিল, কিন্তু তার জন্য কোনো বেতন দিত না। আমি যখন লন্ডনে পৌঁছুলাম তখন আমার পোশাক ছিন্ন ও নোংরা। পকেটে সম্বল ছিল একটি মাত্র ডলার। সেটা দিয়ে আমার একদিনের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হল। পরের দিন আহার-বাসস্থান ছাড়াই কেটে গেল। তার পরদিন সকাল দশটার সময় ক্ষুধার্ত ও ধূলিমলিন অবস্থায় খুব কষ্টে পোর্টল্যান্ড প্লেস দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তখন দেখি, একটা ছেলে আমার পাশাপাশি যাচ্ছে। সে চমৎকার একটা নাশপাতি এক কামড় খেয়েই রাস্তার পাশের ঢালু জায়গায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং কাদায় নিক্ষিপ্ত লোভনীয় ওই বস্তুটার ওপর আমার লুব্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। আমার জিভে জল এসে গেল, ঠোঁট-দুটো লোলুপ হয়ে উঠল এবং আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে সেটাকে কামনা করতে লাগলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যটাই যেন কেমন! যখনই ওটাকে তুলবার জন্য অগ্রসর হতে যাই অমনি কোনো পথচারীর চোখে আমার উদ্দেশ্য ধরা পড়ে যায়। আমি অবশ্য তখনই নিজেকে সংবরণ করে নিই এবং অন্যমনস্ক হয়ে এমন একটা ভাব দেখাই যে, আমি নাশপাতিটার কথা আদৌ চিন্তা করছি না। এই একই কাণ্ড বারবার ঘটতে লাগল। কিন্তু আমি কিছুতেই নাশপাতিটাকে তুলতে পারলাম না। অবশেষে আমি মরিয়া হয়ে, লজ্জা-শরম ত্যাগ করে যখন নাশপাতিটাকে নিতে যাব এমন সময় আমার পেছনে একটা জানালা থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন : 'ভেতরে এস।'

একজন জমকাল ভৃত্য আমাকে ভেতরে আহ্বান করে একটি সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে গেল। সেখানে দু-জন বুড়ো ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তাঁরা পরিচারককে চলে যেতে বলে আমাকে বসতে বললেন। তাঁরা সবেমাত্র তাঁদের প্রাতরাশ শেষ করেছেন। আহার্যের অবশিষ্টাংশ যা টেবিলে ছিল, তা আমাকে প্রলুব্ধ করল। এই আহার্য দ্রব্য সামনে নিয়ে মাথা ঠিক রেখে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা তখন আমার পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু আমাকে আহারে আহ্বান জানালেন না তাঁরা। সুতরাং অতিকষ্টে আমাকে লোভ সংবরণ করতে হল।

এর আগে সেখানে কিছু একটা ঘটে গিয়েছিল, যা জানতে পেরেছিলাম বহু দিন পরে।

Banglainternet.com

ব্যাপারটা আমি এখনই বলছি। ওই বুড়ো দু-জন পরস্পর ভাই। গত কয়েক দিন যাবত দু-জনে কোনো-একটা বিষয় নিয়ে খুব ঝগড়া করে কাটাচ্ছিলেন এবং ইংরেজদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ওই দিনই একটি বাজি রেখে তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হয়ত অনেকেরই মনে আছে, ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড একবার বিদেশের সঙ্গে বিশেষ কোনো আদান-প্রদান সুবিধার্থে দুটি দশলক্ষ পাউন্ডের নোট ছেপেছিল। যে-কোনো ভাবেই হোক, তার একটি ব্যবহৃত হয়ে বাতিল হয়ে গিয়েছিল আর অন্যটি তখনও ব্যাঙ্কের হেফাজতে ছিল। ঐ নোটটাই সব গোলমালের উৎস। কথাপ্রসঙ্গে এক ভাই বলেছিলেন : যদি এমন হয় যে, একজন সৎ এবং বুদ্ধিমান আগন্তুক লন্ডনে এসে আটকে গেল। তার কোনো বন্ধুবান্ধবও শহরে নেই, সঙ্গে টাকাও নেই—আছে শুধু দশলক্ষ পাউন্ডের একখানা নোট। আর নোট-প্রাপ্তির কোনো উপযুক্ত কারণ দর্শাবার উপায়ও তার নেই। এ-অবস্থায় ওই আগন্তুকের জীবিকা-নির্বাহের কী উপায় হবে?

'ক' ভাই বলেছিলেন, সে আনাহারে মারা পড়বে। 'খ' বলেছিলেন, না তা হবে না। 'ক' ভাই বলেছিলেন, সে ওই নোটটি কোনো ব্যাঙ্কে ভাঙাবার জন্য উপস্থিত করতে পারবেন না। কারণ, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করা হবে। তাদের তর্কের এক উত্তপ্ত পর্যায়ে 'খ' ভাই কুড়িহাজার পাউন্ড বাজি রাখলেন এই বলে যে, লোকটি ওই দশলক্ষ পাউন্ডের ওপর নির্ভর করে যে-কোনো উপায়েই হোক ৩০ দিন কাটাতে পারবে এবং জেলে যাওয়া থেকেও এড়িয়ে থাকতে পারবে। 'ক' ভাই সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলেন। খাঁটি ইংরেজ যেমন সাহসের পরিচয় দেয়, ঠিক তেমনি তিনি এ-কাজটি সম্পন্ন করলেন। এরপর তিনি তাঁর কেরানিকে একখানি চিঠির মুসাবিদা দিলেন। এবং কেরানিটি পরিষ্কারভাবে চিঠিটা লিখে ফেলল। দুই ভাই সারাদিন জানালার ধারে বসে রইলেন একজন উপযুক্ত লোকের সন্ধানে।

অনেককেই তাঁদের সৎ বলে মনে হল কিন্তু খুব বুদ্ধিমান মনে হল না : তেমনি অনেককে বুদ্ধিমান মনে হল, কিন্তু সৎ মনে হল না। কেউ হয়ত দুই-ই, কিন্তু গরিব নয়; গরিব হলেও হয়ত আগন্তুক নয়। একটা-না-একটা ত্রুটি থেকেই যাচ্ছিল প্রায় প্রত্যেকেরই আমি সেখানে উপস্থিত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত। আমাকে দেখে তাঁরা নিশ্চিত হলেন যে, আমি সমস্ত শর্ত পূর্ণ করেছি। সুতরাং, আমাকে তাঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করলেন।

এতক্ষণ ধরে আমাকে ডেকে আনবার কারণ জানবার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি। তাঁরা আমাকে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং খুব শিগগিরই আমার সমস্ত ঘটনা জেনে নিলেন। অবশেষে তাঁরা বললেন, আমাকে দিয়েই তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হবে।

আমি বললাম, আমি খুব খুশি হয়েছি। জানতে চাইলাম, আমাকে কী করতে হবে। তখন তাঁদের একজন আমার হাতে একখানা খাম দিলেন এবং বললেন, আমি তার ভেতর থেকেই প্রায়োজনীয় তথ্য জানতে পারব। আমি খামটি খুলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তাঁরা আমাকে নিষেধ করে বললেন, নিজের ঘরে গিয়েই যেন সেটা খুলি এবং তা যেন মনোযোগ দিয়ে পড়ি। তাঁরা আমাকে তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করে দিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। এ-ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে আরও কিছু আলাপ-আলোচনা করতে চাইলাম। কিন্তু তাঁরা তাতে রাজি হলেন না; আমাকে কেন্দ্র করে এমনি তামাশা করায় আমি কিছুটা অপমান বোধ করলাম এবং একটু মনক্ষুণ্ন অবস্থায় তাঁদের অনুমতি নিয়ে চলে এলাম। কিন্তু আমি তাঁদের দেয়া দায়িত্ব গ্রহণ করলাম—যেহেতু ধনী ও প্রভাবশালী লোকের সঙ্গে ঝগড়া করার মতো অবস্থা আমার তখন নয়।

আমি হয়ত সমস্ত জগতের সামনে দাঁড়িয়ে তখন সেই নাশপাতিটা তুলে খেয়ে ফেলতে

পারতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা তার যথাস্থানে নেই। এই লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যে ওটাকে হারালাম, তার জন্য তাঁদের প্রতি আমার অন্তর ঠিক সদয় হল না। সেই বাড়ি আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে আমি খামটি খুললাম এবং দেখলাম, তার ভেতরে টাকা আছে। তাঁদের প্রতি আমার ধারণা কিছুটা পরিবর্তিত হল। আমি এক মুহূর্তও আর দেরি না করে টাকা এবং নোট আমার জামার পকেটে রাখলাম এবং নিকটস্থ সস্তা হোটেলের দিকে ধাবিত হলাম। সেখানে গিয়ে খেলাম খুব করে। খাওয়া শেষ হবার পর আমি নোটটি বের করলাম। ভাঁজ খুলে নোটটার দিকে এক নজর তাকানো মাত্রই বিস্ময়ে আমার জ্ঞান হারাবার উপক্রম। পঞ্চাশলক্ষ ডলার! আমার সমস্ত মাথাটি বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। আমি হয়ত বজ্রাহতের মতো নোটের দিকে তাকিয়ে বসেই থাকতাম, কিন্তু এক মিনিট না-যেতেই নিজকে সুস্থির সম্বিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হল। প্রথমেই চোখে পড়ল, হোটেলের মালিককে। দেখলাম সে-ও এই নোটের দিকে তাকিয়ে আছে এবং সে ভয়ে প্রায় কাঠ হয়ে গেছে। মনে মনে সে ঈশ্বরের নাম জপছিল কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল, সে হাত-পা নাড়া-চাড়া করতে পারছে না। আমি সোজা তার কাছে গেলাম। আমার পক্ষে ওই অবস্থায় যা করা উচিত ছিল তাই করলাম। নোটটি তার কাছে বাড়িয়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বললাম : 'ভাঙতি দিন।'

আমার কথায় সে যেন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল এবং নোটটি ভাঙিয়ে দিতে না পারার জন্য হাজার বার আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করল। কিন্তু কিছুতেই তাকে দিয়ে নোটটি স্পর্শ করানো গেল না। সে কেবল তাকিয়ে রইল নোটটার দিকে। দেখে মনে হল, কিছুতেই যেন তার চোখের তৃষ্ণা মিটছে না। সে এমন একটা ভাব দেখাল যে, তার মতো গরিব লোকের পক্ষে এত পবিত্র জিনিস স্পর্শ করা উচিত নয়। আমি বললাম :

'আমি দুঃখিত যে, আপনার অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু নোটটা ভাঙাতে আপনার হবেই। দয়া করে ভাঙতি দিন। কেন না, আমার কাছে আর কিছুই নেই।'

সে বলল, 'তাতে কিছু যায় আসে না। দেনা-পাওনাটা পরে মেটালেও চলবে।' আমি বললাম, 'কিছুদিনের জন্যে আমি আশেপাশে নাও থাকতে পারি।' সে উত্তরে বলল, 'সেজন্যে ভাবনা করার কিছু নেই, সে অপেক্ষা করে থাকতে রাজি আছে।' পরন্তু, এমন ভাব দেখাল যে, আমি তার কাছ থেকে যে-কোনো জিনিস যে-কোনো সময় নিতে পারি এবং যত দিন খুশি তার দাম বাকি রাখতে পারি। সে বলল, 'আমার মতো একজন ধনী ভদ্রলোককে বিশ্বাস করতে তার কোনো ভয় নেই। বিশেষ করে আমার মতন একজন খেয়ালি লোককে, যে সাধারণ পোশাক পরে নিজের পরিচয় ঢেকে রেখে সাধারণ লোকের সঙ্গে ভাব করতে কৌতুক বোধ করে।' এরইমধ্যে অন্য একজন খরিদ্দার সেখানে প্রবেশ করলে দোকানের মালিক ইঙ্গিতে আমাকে ওই লোকটির দৃষ্টি থেকে দূরে থাকতে অনুরোধ করল। তারপর বেরিয়ে আসবার সময় সে দরজা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসে বার বার অভিবাদন করতে লাগল। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা রওয়ানা হলাম সেই ভাইদের বাড়িতে। উদ্দেশ্য পুলিশ আমার পিছু নেবার আগেই আমি নিজে যেন তাদের ভুলটি সংশোধন করে দিতে পারি। আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম—বস্তুত, ভিতই হয়ে পড়েছিলাম—যদিও আমার নিজের কোনো দোষ ছিল না। কিন্তু আমি জানি, লোকে যখন এক পাউন্ড মনে করে দশলক্ষ পাউন্ডের একটা নোট রাস্তার একটা নিঃস্বের হাতে দিয়ে দেয়, তখন নিজের বোকামির কথা না-ভেবে ওই লোকটির ওপর ভয়ানক রেগে যায়। আমি সেই বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার পর আমার উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হল। দেখলাম সবাই সেখানে বেশ চুপচাপ। অর্থাৎ ভুলটা

banglainternet.com

তখনও ধরা পড়ে নি। ঘণ্টা বাজালাম। সেই ভৃত্যটি এল। আমি তাকে বললাম, ওই ভদ্রলোক দুজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

'তাঁরা চলে গেছেন,' তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গম্ভীর ও নির্বিকার চিত্তে ভৃত্যটি জবাব দিল।

'চলে গেছেন! কোথায়?'

'ভ্রমণে।'

'ঠিকানা?'

'বোধহয় অন্য কোনো মহাদেশে।'

'অন্য মহাদেশে!'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কোন পথে, কিসে গেছেন?'

'আমি জানি না।'

'কখন তাঁরা ফিরবেন?'

'বলে গেছেন, একমাসের মধ্যে।'

'একমাস! ভয়ানক ব্যাপার! তাঁদের সঙ্গে কিভাবে কথার আদান-প্রদান করা যায়, সে সম্বন্ধে আমাকে বুদ্ধি বাতলে দাও তো। অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার।'

'আমি অক্ষম স্যার। আমার ধারণাই নেই যে, তাঁরা কোথায় গেছেন।'

'তা হলে তাঁদের পরিবারের কোনো লোকের সঙ্গে দেখা করতে হয়।'

'পরিবারের সবাই বাইরে। কয়েক মাস আগেই তাঁরা গেছেন। তাঁরা মিসর এবং ভারতে আছেন বলে মনে হয়।'

'তাদের বিরাট একটা ভুল হয়ে গেছে। আমার ধারণা রাত হবার আগেই তাঁরা নিজেদের ভুল টের পেয়ে ফিরে আসবেন। তাঁদের বল যে, আমি এসেছিলাম এবং ব্যাপারটা মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত আমি আসতে থাকব। তাঁদের ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই।'

'তাঁরা এলে আমি বলব। কিন্তু তাঁদের ফিরবার কোনো সম্ভাবনাই আমি দেখছি না। তাঁরা বলে গেছেন, আপনি একঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের খোঁজ করতে আসতে পারেন। তাঁরা আমাকে হুকুম দিয়ে গেছেন। আমি যেন আপনাকে বলে দেই যে, সব কিছু ঠিক আছে। যথাসময় তাঁরা এখানে উপস্থিত হবেন এবং তখন তাঁরা আপনার উপস্থিতি আশা করেন।'

অতএব আমাকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। কী বিশ্রী সমস্যা! আমার মনটা ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। তাঁরা এখানে আসবেন 'যথাসময়ে—' তার অর্থ কী? ও হ্যাঁ, খামের ভেতরকার চিঠিটায় হয়ত এর একটা হদিস থাকতে পারে। এতক্ষণ চিঠির কথা ভুলে ছিলাম। চিঠিটা বের করে পড়তে আরম্ভ করলাম। তাতে লেখা ছিল :

'আপনি একজন বুদ্ধিমান ও সৎলোক—সেটা যে-কেউ আপনাকে দেখলে বলে দেবে! আমরা মনে করি, আপনি দরিদ্র এবং এখানে আগন্তুক। চিঠির সঙ্গে টাকা দেয়া হল। তিরিশ দিনের জন্যে সে টাকা আপনাকে বিনা সুদে ধার দেওয়া হল। ওই সময় উত্তীর্ণ হলে আপনি এ-বাড়িতে আসবেন। আপনার ওপর আমি বাজি রেখেছি। যদি আমি সেটা জিতে যাই, তাহলে আপনার পছন্দসই ও যোগ্যতা মাফিক আমার দানপত্রের আওতাভুক্ত ভালো একটা চাকরির ব্যবস্থা আপনাকে করে দেব।'

চিঠিতে কোনো সই, ঠিকানা বা তারিখ ছিল না। একটা বিরাট ঘোরাল ব্যাপার!...

এটা আমার পক্ষে একটা গভীর ও জটিল ধাঁধা। তাদের মতলবটা কী, তার এতটুকুও

বুঝতে পারলাম না। এর দ্বারা আমার ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে, না আমাকে দয়া করা হচ্ছে তাও বুঝতে পারলাম না। একটা পার্কে গিয়ে বসলাম এবং চিন্তা করে বার করতে চেষ্টা করলাম, আমার কী করা উচিত। একঘণ্টা ধরে নিজে যুক্তিতর্কের অবতারণা করে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুলাম। সিদ্ধান্তটা এ-রকম :

ওই লোক দুটি আমাকে ভালো মনে করেছে, না খারাপ মনে করেছে—তা ঠিক করবার কোনো উপায় নেই। সেটা তাঁদের একটা খেয়াল, না মতলব, না একটা পরীক্ষা—তা, বুঝবার কোনো উপায় নেই—থাকগে সেটাও। আমার ওপর বাজি রাখা হয়েছে। কিসের বাজি—তাও জানবার উপায় নেই। এ-রকম অসংখ্য সমাধানবিহীন বিষয় ভেবে অবশিষ্ট যেটা রইল সেটা চলমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু এবং তাকে বাস্তব সত্যের পর্যায়ে ফেলা চলে। যদি আমি ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডকে নোটটা ওই লোকের নামে জমা করে নিতে বলি, তারা সেটা করবে, যেহেতু ব্যাঙ্ক তাঁকে জানে—যদিও আমি তাঁর কিছুই জানি না। কিন্তু তারা আমাকে জিজ্ঞেস করবে, আমি কী করে ওটা পেলাম। যদি সত্যি কথা বলি তবে আমাকে সঙ্গতভাবেই পাগলা-গারদে পাঠাবে; আর যদি মিথ্যে কথা বলি, তা হলে পাঠাবে জেলে। যদি আমি এটা ভাঙাতে চেষ্টা করি অথবা এর বদলে টাকা ধার নিই, তা হলেও একই ফল হবে। আমার পছন্দই হোক বা অপছন্দই হোক, ওই ভদ্রলোক দু-জন না-আসা পর্যন্ত এ-বিরাট বোঝা আমাকে যে বয়ে বেড়াতে হবে। একমুঠো ছাইয়ের মতো এটা আমার কাছে মূল্যহীন। তবুও জীবিকা অন্বেষণের খাতিরেই এ-নোটখানার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। ইচ্ছে করলেও আমি এটা কাউকে দিয়ে দিতে পারব না। একজন লোক তা সে সৎ কিংবা ডাকাত যাই হোক, কোনো প্রয়োজনেই এটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে পারে না। ওরা দু-ভাই নিরাপদেই আছেন। যদি আমি তাঁদের এই নোটটা হারিয়ে অথবা পুড়িয়ে ফেলি, তা হলেও তাঁরা নিরাপদ। কেননা তাঁরা এই নোটটার ভাঙতি বন্ধ করে দিতে পারেন এবং পরে ব্যাঙ্ক থেকে তাঁদের সমস্ত টাকাই তুলে নিতে পারেন। কিন্তু আমাকে বিনা মজুরিতে এই একমাস যাবত দুর্ভোগ পোহাতেই হবে, যদি না সেই বাজিটা—সে যাই হোক না কেন—জিতে প্রতিশ্রুত চাকরিটা না পাই। আর সেটা আমার পেতে হবে। তাঁদের পর্যায়ের লোকেরা দানস্বরূপ যে চাকরি আমাকে দেবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে নিশ্চয়ই।

চাকরির ব্যাপারে সম্বন্ধে আমি বেশ কিছু ভাবতে আরম্ভ করলাম। আমার আশা বেড়ে যেতে লাগল। বেতন নিশ্চয়ই খুব বেশি হবে। একমাস পরেই চাকরিটা হবে এবং তার পরেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোক বলে অনুভব করতে লাগলাম। আমি আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম। একটা দর্জির দোকান দেখে আমার মনে ময়লা কাপড়-চোপড় ছেড়ে সুন্দর বেশভূষা পরবার বাসনা জেগে উঠল। আমার সে-সংস্থান আছে কি? না, পৃথিবীতে আমার দশলক্ষ পাউন্ড ছাড়া আর কিছুই নেই। সুতরাং, নিজেকে জোর করেই সেখান থেকে টেনে নিয়ে গেলাম। কিন্তু পরে আবার পিছুটান বোধ করতে লাগলাম। লোভ আমাকে পীড়া দিতে লাগল। যতক্ষণ আমার ভেতরে এই দ্বন্দ্ব চলছিল ততক্ষণ আমি দোকান ছাড়িয়ে আরও ছয়গুণ পথ অতিক্রম করতে পারতাম। অবশেষে লোভের কাছে পরাভব স্বীকার করতে হল—তাছাড়া উপায় ছিল না। দর্জির দোকানের ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের কাছে গায় লাগে নি বলে ফেরত দেয়া কোনো স্যুট আছে কি না। যে লোকটির সঙ্গে কথা বললাম, সে উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নেড়ে অন্য একটা লোককে দেখিয়ে দিল। তার কাছে গেলাম; সেও মাথার ইঙ্গিতে অন্য লোককে দেখিয়ে দিল, কিন্তু কথা বলল না। আমি তার কাছে যেতেই সে বলল : একটু

অপেক্ষা করুন, আপনার কথা শুনছি।'

তার কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। তারপর সে আমাকে পেছনের কামরায় নিয়ে গেল এবং বাতিল স্যুটের এক গাদার মধ্যে সন্ধান করে সবচেয়ে বিশ্রী একটা স্যুট আমার জন্যে বের করল। আমি সেটা পরলাম। কিন্তু আমার গায়ে লাগল না এবং কোনোমতেই সেটা আমার মনমতো হল না। কিন্তু নতুন বলে সেটা না-নেবার লোভ সামলাতেও পারছিলাম না। কোনো ত্রুটির কথা উল্লেখ না করে দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বললাম :

'এর দামের জন্যে যদি কিছুদিন আপনি অপেক্ষা করতে পারেন, তবে আমার বড় সুবিধে হয়। আমার কাছে খুচরো টাকা নেই।'

আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেই লোকটির চোখে-মুখে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল। সে বলল :

'ও, আপনার কাছে নেই! আমি সেটা আশাও করি নি। আপনার মতো লোকের কাছে বেশি টাকা থাকাই স্বাভাবিক।'

আমি খুব আঘাত পেলাম এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম :

'বন্ধু, কোনো লোককে শুধু পোশাক দিয়ে বিচার কর না। আমি সহজেই এই স্যুটের দাম দিতে পারি। বড় একটা নোট ভাঙানোর জন্যে তোমাকে আমি কষ্ট দিতে চাই নি।'

এ-কথায় সে তার ধরনটা একটু পরিবর্তন করল। তবুও সেই ভাব বজায় রেখে বলল : 'আপনাকে কোনোরকম খারাপ ইঙ্গিত করে আমি কথাটি বলি নি। তবু বলতে চাই আপনার নোটের ভাঙতি দিতে পারি কি না, সেটা আপনার দেখবার বিষয় নয়। আশা করি আমরা ভাঙতি দিতে পারব।'

আমি নোটটি তার হাতে দিয়ে বললাম : 'বেশ আমি মাফ চাইছি।' হেসে সে নোটটি হাতে নিল—তার মুখে একগাল হাসি। তার সমস্ত মুখে ভাঁজ পড়ে ক্রুর প্যাঁচের মতো রেখার সৃষ্টি হল এবং পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে মারলে সে জায়গায় যে ধরনের ঢেউ সৃষ্টি হয়, তার মুখের অবস্থাও তেমনি হয়ে উঠল। কিন্তু নোটটির ওপর দৃষ্টি দিতে গিয়েই তার হাসি হঠাৎ থেমে গেল এবং মুখাবয়ব হলুদবর্ণ হয়ে উঠল। বিসুভিয়াসের গরম লাভা পাশের মাটিতে পড়ে যেমন শক্ত হয়ে যায়, তার হাসিও হঠাৎ থেমে গিয়ে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিল। আমি কখনও কোনো হাসি হঠাৎ থেমে গিয়ে এমনি স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখি নি। লোকটি নোটটি ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। দোকানের মালিক ছুটে এল কী ঘটেছে তা দেখতে এবং তেজের সঙ্গে বলল :

'কী হয়েছে? অসুবিধেটা কী? কী চাই?'

আমি বললাম, 'অসুবিধা তেমন কিছু নয়। আমি আমার ভাঙতির জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'টড শিগগির ভাঙতি দিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি কর।'

টড একটু ঠাট্টার সুরে বলল : 'ভাঙতি দিয়ে দাও বলাটা তো খুব সোজা, স্যার। নোটটা নিজে একবার দেখুন।'

দোকানের মালিক নোটটা দেখল এবং আস্তে শিস দিতে লাগল। তারপর পরিত্যক্ত কাপড়ের গাদার ওপর এসে এটা-ওটা টেনে বের করতে লাগল এবং ক্রমে বেশ উত্তেজিতভাবে আপন মনে বলতে লাগল :

'একজন খেয়ালি কোটিপতিকে এমনি একটা বাজে স্যুট বিক্রি করছ, টড। তুমি আস্ত একটা বোকা। একেবারে নিরেট বোকা। সবসময় এমনি একটা কিছু করে চলেছে যাতে সব কোটিপতিরা এখান থেকে একে একে সরে যাচ্ছে। সাধারণ বেশভূষার মধ্যে কে যে কোটিপতি, তা ও কখনই চিনে বের করতে পারে না। হ্যাঁ, এটাই আমি খুঁজছিলাম, স্যার। ওগুলো খুলে

আগুনে ফেলে দিন, স্যার। এই যে স্যার, এই স্যুট—এটাই উপযুক্ত জিনিস। এমনি দামি স্যুট ডিউকদের মর্যাদার উপযোগী। কোনো একজন বিদেশি রাজকুমারের জন্যে এটা তৈরি করা হয়েছিল। আপনি তাঁকে চিনবেন, স্যার। তিনি হচ্ছেন, মাননীয় হ্যালিফাক্সের হস্‌পডোর। এটাকে আমরা এখানেই রেখে দিয়েছি অনেকদিন ধরে, কারণ, তাঁর মা মরণোন্মুখ। এখন তিনি শোক-বসন পরে আছেন। অবিশ্যি, তার মা এখনও মারা যান নি। সব ঠিকই আছে। আমরা সবসময় আমাদের অর্থাৎ তাঁদের রুচি অনুযায়ী জিনিস রাখতে পারি না। প্যান্টে আপনাকে সুন্দর মানিয়েছে। এখন ওয়েস্ট কোট হল, এখন কোট। এখন দেখুন, সব ঠিক হয়েছে। আমি কখনও এত সুন্দর মানানসই পোশাক আর দেখি নি।'

আমি সন্তোষ প্রকাশ করলাম।

'ঠিক, ঠিক স্যার, এ দিয়ে আপনার কোনো রকমে কাজ চলে যাবে—আমি বলতে পারি। কিন্তু দয়া করে আপনি দেখুন, আপনার নিজের মাপে আমরা কত সুন্দর জিনিস তৈরি করি। টড, খাতাপত্র নিয়ে এস। লেখ, পায়ের লম্বা মাপ ৩২—' ইত্যাদি।

আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই স্যুট, প্রাতঃবাস, শার্ট এবং অন্যসব পোশাকের মাপ নিয়ে ফেলল। সব শেষ হলে একটু সুযোগ পেয়ে বললাম : 'কিন্তু মহোদয়, আপনি নোটটি ভাঙিয়ে না দিলে কিংবা দামের জন্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অপেক্ষা না করলে আমি যে এগুলোর ফরমাশ দিতে পারি নে।'

'অনির্দিষ্ট কাল? এটা তো একটা সামান্য কথা, স্যার। বলুন, চিরকাল সেটাই উপযুক্ত কথা। টড শিগগির কাজগুলো শেষ করে ফেলবে এবং সময় নষ্ট না করে স্যারের বাড়িতে পৌঁছে দেবে। সাধারণ খরিদ্দার অপেক্ষা করুক। স্যারের ঠিকানাটা লিখে নাও টড এবং—'

'আমি বাড়ি বদল করছি। আমি এখানে এসে নতুন ঠিকানা দিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, স্যার। এক মিনিট, আপনাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, স্যার। এই পথে। আচ্ছা, গুড বাই।'

নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছেন, কী ঘটতে যাচ্ছে? স্বভাবতই আমার যা-ই প্রয়োজন, তা কিনতে গিয়ে ভাঙতি চেয়ে বসি। এক সপ্তাহের ভেতর আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার প্রয়োজনীয় সামগ্রী-সম্ভারে আমি সুসজ্জিত হয়ে পড়লাম। হ্যানোবার স্কোয়ারের ব্যয়বহুল এক হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করলাম। সেখানেই খাওয়া দাওয়া করতাম; কিন্তু নাস্তার জন্যে হ্যারিসের সেই অনাড়ম্বর হোটেলে যেতাম। সেখানেই প্রথমে আমার দশলক্ষ পাউন্ডের নোট দেখিয়ে খেয়েছিলাম। হ্যারিসই আমাকেই মানুষ করেছে। সারা দেশে হ্যারিস সংবাদ ছড়িয়েছেও যে বিদেশি খেয়ালি ভদ্রলোক জামার পকেটে দশলক্ষ পাউন্ডের নোট নিয়ে ঘুরে বেড়ান, তিনি এই হোটেলের মহান পৃষ্ঠপোষক। এইটুকুই যথেষ্ট। অল্প পুঁজির দীনদরিদ্র গোছের হোটেল প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল এবং খরিদ্দারের ভিড় বেড়ে গেল। হ্যারিস এত কৃতজ্ঞ হল যে, সে জোর করে আমার ওপর ধার চাপাতে লাগল এবং তা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। আমার মতো নিঃস্ব লোকের ব্যয় করবার মতো যথেষ্ট অর্থাগম হল। ধনী ও বড়লোকের মতো আমি বাস করতে লাগলাম। আমি বুঝে নিয়েছি, শেষে সব ভেঙে পড়বে; কিন্তু যেহেতু একবার এই গোলক-ধাঁধায় ঢুকে পড়েছি, তখন সাঁতরে পারে যেতেই হবে অথবা ডুবে মরতে হবে। সামনে ধ্বংস আসন্ন—এমনি একটা পরিস্থিতি। তার থেকে বাঁচতে হলে অতি সাবধানে, ধীর-স্থিরভাবে উপায় বার করতে হবে। অন্যথায়, সমস্ত ব্যাপারটা হাস্যস্পদ হয়ে পড়বে। রাত্রে ও অন্ধকারে বিয়োগান্ত অংশটুকু থাকত আমার সামনে এবং সব সময় সেটা আমাকে সতর্ক করত আর ভয় দেখাত। সুতরাং, আমি আফসোস করতাম এবং

BanglaInternet.com

বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটাতাম। ঘুম সহজে আসতে চাইত না। দিনের বেলায় বিষাদের অংশটুকু কমে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত এবং আমি মুক্ত হাওয়ায় জড়তা ও উন্মত্ততা পরিহার করে চলে-ফিরে বেড়াতাম। সেটা খুব অস্বাভাবিক ছিল। কারণ, আমি পৃথিবীর এই সেরা রাজধানীতে খ্যাতনামা হয়ে পড়লাম। সেটা শুধু আমাকে একটু-আধটু বিচলিত করেই ছাড়ে নি—আমার মাথা একদম ঘুরিয়ে দিল। এমন একটি সংবাদপত্র পাবেন না—কী ইংরেজি, স্কটিশ কিংবা আইরিশ—যাতে পকেটে দশলক্ষ পাউন্ডের নোটওয়ালার সর্বশেষ কাজ এবং বক্তব্যের কোনো উল্লেখ নেই। প্রথমে আমার কথা উল্লেখ করা হয় বিবিধ কলামের নিচের দিকে, তারপর নাইটদের ওপরে, তারপর ব্যারনদের। এইভাবে নাম যত ছড়াতে লাগল তত ওপরের দিকে উঠতে লাগল—যতক্ষণ না একেবারে সর্বোচ্চ স্থানে গিয়ে পৌঁছুলাম। সেটা হল ডিউকের ওপরে এবং রাজবংশীয় ডিউকদের নিচে, সর্বশ্রেণীর পাদরিদের ওপরে—শুধু প্রধান ধর্মযাজকের নিচে। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, এগুলো আমার সুখ্যাতি নয়, আমি দুর্নামই কামাই করছি। এরপর এল সর্বোচ্চ সম্মানের পুষ্পবৃষ্টি—যা আমাকে অগৌরবের তলদেশ থেকে সর্বময় খ্যাতিতে ভূষিত করে ফেলল। 'পাঞ্চ' পত্রিকা আমার এক ব্যঙ্গচিত্র ছাপাল। এটাই আমাকে মানুষ করল এবং আমার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হল। লোকে আমাকে এখনও ঠাট্টা করতে পারে, কিন্তু সেটা সম্মানসূচকভাবে—জঘন্য বা কঠোরভাবে নয়। আমাকে দেখে লোকে হাসতে পারে—কিন্তু উপহাস করবে না। সে সময় চলে গেছে। পাঞ্চের ব্যঙ্গচিত্রে আঁকা হল : আমি নোংরা পোশাকে ভূষিত হয়ে লন্ডন টাওয়ারে যাবার জন্য রাজার দেহরক্ষী সেনাদলের সঙ্গে লড়াই করছি। এখন আমার অবস্থা সহজেই কল্পনা করতে পারেন। একজন যুবক যাকে কেউ কখনও চিনত না—এখন তার এমন একটা কথা বলবার উপায় নেই, যা নাকি সঙ্গে সঙ্গে লোকের মুখে পুনরুল্লেখ না হবে। বাইরে বেরুলেই শোনা যাবে, লোকে বলাবলি করছে : 'এই তিনি যাচ্ছেন। এই তো তিনি।' নাস্তা খেতে গেলে বিরাট এক জনতা তাকিয়ে থাকবে। কোনো নাট্যশালায় গেলে অসংখ্য অপেরা গ্লাস দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হবে আমার ওপর। আমি যে কী বিরাট গৌরবের ওপর সাঁতার কাটছিলাম, এই হল তার কিছু নমুনা।

আমি আমার সেই নোংরা স্যুটটি রেখেছিলাম এবং মাঝেমাঝে সেটা পরে ছোটখাট জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে অপমানিত হওয়া এবং পরক্ষণেই দশলক্ষ পাউন্ডের নোট বের করে দোকানদের অপ্রস্তুত করে দেবার আনন্দ উপভোগ করতাম। কিন্তু সেটা বেশি দিন চালাতে পারি নি। সচিত্র কাগজগুলো আমার সে-পোশাকটিকে এত পরিচিত করে ফেলেছিল যে, যেমনটি আমি সেটা পরে বের হতাম অমনি আমাকে চিনে ফেলত সবাই এবং একটা বড় জনতা আমার পেছন পেছন অনুগমন করত। আর কোনো জিনিস কিনতে গেলে নোট বের করবার আগেই দোকানদার তার সমস্ত জিনিস আমাকে বাকি দিতে রাজি হয়ে যেত।

আমার সুখ্যাতির দশম দিনে আমি আমার জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে আমাদের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে গেলাম। এ-ক্ষেত্রে যতটা উৎসাহ দেখানো সম্ভব, তা তা দেখিয়েই তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু এত দেরিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় তিনি যথেষ্ট অনুযোগ করলেন এবং বললেন :

এ-ত্রুটি তিনি ক্ষমা করতে পারেন, যদি আমি ওই রাতে তাঁর বাড়িতে নৈশভোজে আমন্ত্রিত অতিথিদের একজনের অসুস্থতা-জনিত অনুপস্থিতির শূন্যতা পূর্ণ করি। আমি রাজি হলাম এবং আমরা দু-জন কথাবার্তা বলতে লাগলাম। কথাপ্রসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল, তিনি এবং আমার বাবা স্কুলে সহপাঠি ছিলেন। পরে ইয়েলেও তাঁরা একত্রে লেখাপড়া করেছেন।

সুতরাং, তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে সময়-অসময়ে আসা-যাওয়া করতে অনুরোধ করলেন এবং আমি খুব আনন্দের সঙ্গে তাতে রাজি হলাম। আসলে এতে আমার খুব আগ্রহ ছিল এবং এ-ব্যাপারে আমি খুব খুশি হলাম। কারণ, যখন আমার ওপর ধ্বংস নেমে পড়বে তখন হয়ত তিনি আমাকে রক্ষা করতে পারবেন। কী ভাবে পারবেন, বলতে পারি না। তবে হয়ত চিন্তা করে তিনি একটা পথ বের করতে পারবেন। কিন্তু এত দেরিতে তাঁর কাছে আমার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার সাহস হল না। লন্ডনে আমার এ অদ্ভুত জীবনযাত্রার শুরুতে আমি হয়ত অসংকোচে তাঁকে সবকিছু বলে ফেলতাম। না, এখন সেটা বলতে সাহস হল না। আমি অনেক জটিলতার ভেতর ঢুকে পড়েছি। অন্তত এতটা বেশি মাখামাখির পর এমনি একজন নতুন বন্ধুর কাছে ব্যাপারটা বলার দায়িত্ব আছে—যদিও তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আওতার বাইরে নয়। কারণ, এত ধার সত্ত্বেও আমি আমার সীমার মধ্যেই আছি—অর্থাৎ আমার বেতনের পরিসীমার মধ্যে। অবিশ্যি আমার বেতন কত হবে, আমি জানি না। তবে বাজি যদি জিতে যাই, তবে ধনী বুড়োর কাছ থেকে যে ভালো একটা দান পাব, সে ব্যাপারে একটা স্থির নিশ্চয়তা ছিল। অবিশ্যি, উপযুক্ত প্রমাণিত হলে, তবেই। আমি যে উপযুক্ত প্রমাণিত হব সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। বাজির ব্যাপারে আমার তেমন দুর্ভাবনা ছিল না। কারণ, সব সময়ই আমি বেশ ভাগ্যবান। বেতন সম্বন্ধে আমার অনুমান ছিল, বছরে কমপক্ষে ৬০০ থেকে ১০০০ পাউন্ড হবে। প্রথম বছরে ৬০০ এবং পরবর্তী বছরে বেড়ে গিয়ে নিজ দক্ষতাবলে সর্বোচ্চ অঙ্কে গিয়ে পৌঁছুব। বর্তমানে আমার মোট দেনা প্রথম বছরের বেতনের সমান। সবাই আমাকে টাকা ধার দিতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তাদের প্রত্যেককে এটা-ওটা অজুহাত দিয়ে বিরত করেছি।

মোট ধার ছিল ৩০০ পাউন্ডের। অবিশ্যি, তিনশ পাউন্ড বাকি সওদা ও থাকা-খাওয়ার দেনা। আমি বিশ্বাস করতাম, বুঝে-শুনে খরচ করলে এবং হিসেব করে চললে আমার দ্বিতীয় বছরের বেতন দিয়ে বাকি মাসটা চালাতে পারব। মাস শেষ হলে আমার মালিক তাঁর ভ্রমণ শেষ করে এসে পড়বেন এবং সব ঠিক হয়ে যাবে। কারণ তখন আমি আমার দু-বছরের বেতনই আমার পাওনাদারদের দিয়ে দিতে পারব এবং সরাসরি কাজে মনোযোগ দিতে পারব।

চৌদ্দজন অতিথির এক মনোজ্ঞ নৈশভোজ। শোরেডিচের ডিউক ও তাঁর পত্নী, তাঁদের কন্যা, লেডি এ্যান-গ্রেস-এলেনর, নিউগেটের আর্ল ও তাঁর ভাই কাউন্ট চিপসাইড, লর্ড ও লেডি ব্লাথের্সকাইট, আরও কয়েকজন খেতাববিহীন নর-নারী, রাষ্ট্রদূত, তাঁর পত্নী ও কন্যা এবং কন্যার পোর্শিয়া ল্যাংহাম নামে ২২ বৎসর বয়স্কা জনৈক ইংরেজ বান্ধবী—যিনি দুমিনিটের মধ্যেই আমার প্রেমে পড়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর প্রেমে পড়ে গেলাম। সেটা স্বচ্ছভাবেই আমার কাছে ধরা পড়ল। আরও একজন অতিথি ছিলেন। তিনি একজন আমেরিকান। কিন্তু আমি গল্পের খেই ছেড়ে দূরে এসে পড়েছি। অতিথিরা তখনও বসবার ঘরে নৈশভোজের জন্যে অপেক্ষা করছেন এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে নবাগতদের লক্ষ করছেন। ইতিমধ্যে পরিচারক ঘোষণা করল :

'মিস্টার লয়েড হেস্টিংস।'

স্বাভাবিক সৌজন্য প্রকাশের পর হেস্টিংসের সঙ্গে চোখাচোখি হলাম। হাত প্রসারিত করে সে সোজা আমার দিকে এগিয়ে এল। এরপর করমর্দন করতে গিয়ে হঠাৎ সে থেমে গেল এবং অপ্রস্তুত হয়ে বলল :

'মাফ করবেন স্যার, মনে হয় আপনাকে আমি চিনি।'

'নিশ্চয়ই চেন। আমরা তো পুরনো পরিচিত।'

'মনে হয় না আপনিই...'

'হ্যাঁ, জামার পকেটে দশলক্ষ পাউন্ডের নোট নিয়ে বেড়ানো সেই দানব? হ্যাঁ, আমি সেই। আমার নতুন ডাক-নামে ডাকতে ভয় পেও না। আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

'কী আশ্চর্য! আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি। কয়েকবারই দেখেছি, তোমার নামের সঙ্গে এই ডাকনাম জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি কখনও ভাবতেই পারি নি যে, এই বহু বিঘোষিত ভদ্রলোকই আমাদের হেনরি এডাম্‌স দি ব্যাজার, ছয় মাস আগেও ফ্রিস্‌কোর ব্ল্যাক হপ্‌কিনসের কাছে তুমি কেরানিগিরি করছিলে। অতিরিক্ত বেতনের জন্য কত রাত জেগে কাটিয়েছ পাউন্ড ও কারি এক্সটেন্‌শনের হিসেবপত্র তৈরিতে তুমি আমাকে সাহায্য করতে । কী করে লন্ডনে আসার মতলব করলে এবং কেমন করে এতবড় খ্যাতনামা কোটিপতি হয়ে পড়লে। কী করে এই আরব্য-উপন্যাস বাস্তবে রূপায়িত হল। আরে, আমি যে কিছুই বিশ্বাস করতে পারছি না। বুঝতেও পারছি না। আমার মাথায় যে আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেটা শান্ত হতে সময় দাও।'

'লয়েড, তুমি আমার চেয়ে বেশি হতবুদ্ধি হও নি। আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারি নে।'

'অবাক করে তুললে যে। তিন মাস আগেই না আমরা খনিশ্রমিকদের রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম।'

'না, হোয়াইট চিয়ারে।'

'ঠিক বলেছ, হোয়াইট চিয়ারেই। এক্সটেনশন কাগজগুলোর জন্য ছয়ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনির পর ভোর দুটোর সময় আমরা সেখানে গিয়ে বসলাম। তোমাকে আমার সঙ্গে লন্ডনে আসবার জন্য কত পিড়াপিড়ি করলাম। তোমার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দিতে চাইলাম। তোমার সমস্ত খরচপত্রও দিতে চাইলাম। তাছাড়া, বিক্রিতে লাভবান হলে তোমাকে কিছু মুনাফাও দিতে চাইলাম। তুমি কিছুতেই আমার কথা শুনলে না—বরং বললে, আমি তাতে সফল হব না। তুমি কাজ ছেড়ে এসে আবার কাজ পাওয়া-না-পাওয়ার অনিশ্চয়তার মধ্যে আসতে চাও নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ তোমাকে এখানে দেখছি। এটা কেমন বেখাপ্পা মনে হচ্ছে। বল, কী করে তুমি এখানে এসে পড়লে এবং কী করেই বা এই অবিশ্বাস্য ভাগ্যলাভ করলে?'

'শোন লয়েড, এটা একটা আকস্মিক ঘটনা। এই দীর্ঘ একটা গল্প—কেউ বলবে, রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আমি তোমাকে সব বলব—তবে এখন নয়।'

'কখন?'

'এ-মাসের শেষে।'

'আরও এক পক্ষকাল বাকি আছে তার। এই দীর্ঘ সময় কৌতূহল দমিয়ে রাখা বিরাট ধৈর্যের ব্যাপার। সময়টা এক-সপ্তাহ কর, ভাই।'

'আমি তা পারব না । কেন পারব না, তাও ধীরে-সুস্থে জানতে পারবে। কিন্তু তোমার ব্যবস্যা কেমন চলছে?'

তার মুখের সমস্ত প্রফুল্লতা একটা নিঃশ্বাসের মতো যেন উবে গেল। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল :

'পল, তুমি সত্যিকারের ভবিষ্যৎ-বক্তা। আমি না-এলেই ভালো করতাম। এ-ব্যাপারে আমি আর কিছু বলতে চাই নে।'

'তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে। এখান থেকে ছাড়া পেলে তুমি আমার সঙ্গে আসবে। রাতে আমার ওখানে থাকবে এবং আমাকে সব খুলে বলবে।'

'সত্যি। তুমি সত্যি কথা বলছ?'—তার চোখে জল এসে পড়ল।

'হ্যাঁ, আমি সমস্ত ঘটনা জানতে চাই, তার প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত।'

'আহ, আমি কৃতার্থ হলাম। আমার জীবনে যা ঘটে গেছে, তারপর তোমার কথায় এবং দৃষ্টিতে আমার প্রতি তোমার যে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, তাতে তোমার কাছে নতজানু হতে ইচ্ছে করছে আমার।'

সে শক্ত করে আমার হাত আঁকড়ে ধরল, ধরে রাখল এবং তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। এরপর নৈশভোজের জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু ভোজ হয়ে উঠল না। সাধারণত ইংরেজ-সমাজে খানাপিনার ব্যাপারে পদমর্যাদার স্তর-ভেদ নিয়ে যে সংকীর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তাই হল। ফলে খাওয়া প্রায় হল না। ইংরেজরা ভোজের নিমন্ত্রণে যাবার আগেই ভোজ শেষ করে যায়। কারণ, তারা সামনের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে সচেতন থাকে। কিন্তু আগন্তুকদের কেউ সতর্ক করে দেয় না। ফলে, তারা একই ফাঁদে পড়ে যায়। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের মতো এ-ধরনের অসুবিধায় কেউ পড়ে নি। কারণ, এর আগে আমরা সবাই ভোজের আমন্ত্রণে গেছি। একমাত্র হেস্টিংস ছাড়া নবীশ কেউ ছিল না। তাকে রাষ্ট্রদূত জানিয়ে দিয়েছিল যে, ইংরেজ-পদ্ধতির এই অনিশ্চয়তার জন্য তিনি কোনো ভোজের বন্দোবস্ত করেন নি। সকলেই একজন করে মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে মিছিল করে ভোজের ঘরে প্রবেশ করল। কারণ, ভোজের জন্য আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের সঙ্গে চলাচল করতে হয়।

কিন্তু এ-ব্যাপারেই প্রথম গোলমাল দেখা দেয়। সোরেডিশের ডিউকই সর্বপ্রথম টেবিলের সামনে গিয়ে প্রধান আসনে বসবার দাবি করলেন। তাঁর ধারণা : একজন রাষ্ট্রদূত একটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করে—কোনো রাজা নয়। কিন্তু আমি আমার প্রাধান্য দাবি করে বসলাম এবং কিছুতেই নতি স্বীকার করলাম না। সংবাদপত্রের বিবিধ পর্যায়ের কলামে রাজবংশীয় ডিউক ছাড়া সকলের আগে আমার স্থান। আমি সে-কথা ঘোষণা করলাম এবং অগ্রাধিকার দাবি করলাম। ঝাঁকাঝাঁকি করে সাধারণত যেমন হয়, এ-ব্যাপারেও তেমনি কোনোরকম মীমাংসায় আসা গেল না। অবশেষে তিনি তাঁর বংশাবলি ও অতীতের পদমর্যাদার উল্লেখ করলেন। তাঁর বংশধররা ছিলেন বিজয়ী যোদ্ধা। সেজন্য আমি তাঁকে আদমের বংশধর বলে তুলে ধরলাম এবং আমাকেও সেই একই আদমের বংশধর বলে পরিচয় দিলাম। বিশেষ করে আমার নামই যখন তার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। পক্ষান্তরে, তাঁর নিজের প্রদত্ত পরিচয়ের বিবরণ থেকে জানা গেছে যে তিনি নরমান জাতির এক অপ্রধান শাখা থেকে এসেছেন। সুতরাং আমরা সবাই আবার মিছিল করে বসবার ঘরে ফিরে এলাম এবং লম্বা সারিতে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সার্ডিন মাছের ঝোল ও স্ট্রবেরি খেলাম। সবাইকে ছোট-ছোট দলে মিলিত হয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হল। এখানে প্রাধান্য বা মর্যাদার প্রশ্ন অতটা পীড়াদায়ক নয়। এ-ক্ষেত্রে খানা শুরু হওয়ার আগে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার দু-জন ভদ্রলোক একটা শিলিং ছুঁড়ে দেন। যিনি জেতেন তিনি স্ট্রবেরি খান, আর যিনি হেরে যান তিনি শিলিংটা পান। পরবর্তী দু-জনও ঠিক অনুরূপভাবে মুদ্রা ছোঁড়ে। তারপর আরো দু-জন, তারপর আরও—এমনি করে চলতে থাকে। খাওয়ার পর আমরা প্রতি খেলায় ছ-পেনি হারে তাস খেলতে বসে গেলাম। ইংরেজরা কেবল আমাদের উদ্দেশে কোনো খেলা খেলে না।

আমাদের সময়টা বেশ কাটল। অন্তত আমার এবং মিস ল্যাংহামের তো বটেই। আমি এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে, অকপটে তার কাছে আমার সব কথা খুলে বললাম।

আমি তাকে বললাম, আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। কথাটা শোনা-মাত্র সে আরক্তিম হয়ে উঠল, যেন তার চুলও লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কথাটা তার মনে ধরেছে। সে বলল যে

BanglaInternet.com

সে আমাকে পছন্দ করেছে। আহ! এমনি একটা স্নিগ্ধ মনোরম সন্ধে আর কখনও আসে নি আমার জীবনে।

তার সঙ্গে আমি পুরোপুরি সহৃদয় ও অকৃত্রিম ভাব বজায় রেখেছিলাম। তাকে জানালাম, যে দশলক্ষ পাউন্ডের নোটের এত গল্প সে শুনেছে, সেটা ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার আর একটা সেন্টও নেই। আবার সেই নোটটাও আমার নয়। কথাটা তার কৌতূহলের উদ্রেক করল। তারপর নিচু গলায় তাকে গোড়া থেকে সমস্ত গল্পটাই বলে ফেললাম। শুনে হাসতে হাসতে তার দম আটকাবার উপক্রম হল। এমন অট্টহাসি হাসবার মতো কী এমন দেখল সে, আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু কারণ নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। প্রতি আধ-মিনিটে একটা নতুন ঘটনার উল্লেখ হতে লাগল। আর তার জন্য তাকে দেড় মিনিট সময় দিতে হত তার বেসামাল হাসি থামাতে। হাসতে হাসতে নিজেকে সে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছে। সত্যি, হাসির আবেগে সে একেবারে নিঃসাড় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এমন কিছু ঘটার মতো কিছুই তো আমি দেখলাম না। কোনো একটা লোকের জীবনের বেদনাময় ঘটনা, তার কষ্ট, উৎকণ্ঠা ও ভয়ের কাহিনী যে কারও এমনি অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, এর আগে তা কখনও দেখি নি। সুতরাং বিনা কারণেও যে সে এত উৎফুল্ল হতে পারে, তার জন্য তাকে আরও বেশি ভালোবেসে ফেললাম। কারণ, ঘটনা যেভাবে এগিয়ে চলছে তাতে আমার এই জাতীয় একটা স্ত্রীর প্রয়োজন ছিল। অবশ্য আমি তাকে বলেছিলাম, দু-বছর আমরা বেতনের টাকা ভোগ করতে পারব না। সে বছর-দুটো আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে। তাতেও তার কোনো আপত্তি ছিল না। শুধু সে আমাকে সাবধান করে দিল, তৃতীয় বছরের বেতনের ওপর যাতে হাত না পড়ে, আমি যেন সেভাবে হিসেব ধরে চলি। তারপর এই ভেবে সে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করল, সত্যিকারভাবে প্রথম বছরের যে বেতনটা পাওয়া যাবে তার চেয়ে বেশি হিসেব ধরা একটা ভুল হয়ে যায় নি তো। আমার মনে হল, সত্যি, এটা একটা চিন্তার বিষয় এবং একথা ভাবতে গিয়ে আগের চেয়ে এ-ব্যাপারে আমার আস্থা অনেকটা কমে গেল। কিন্তু চিন্তাটা আমার মধ্যে একটা ব্যবসায়ী বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিল।

'পোর্শিয়া। প্রিয়তমা। যদি কিছু মনে না কর, সেই বুড়ো ভদ্রলোকদের সামনে যেদিন আমি যাব, সেদিন কি তোমায় সঙ্গে নিতে পারব?'

সে একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। কিন্তু বলল :

'এতে যদি তোমার সাহায্য হয়, তবে অবিশ্যি আমি যাব। তুমি কি মনে কর, সেটা ঠিক হবে?'

'আমি ঠিক বলতে পারি না, ঠিক হবে কিনা। আমার ভয় হয়, হয়ত-বা ঠিক হবে না। কিন্তু এর ওপর আমি এত নির্ভর করে আছি যে—'

'তাহলে ভালো হোক আর মন্দ হোক, আমি অবশ্যই যাব তোমার সাথে।'

স্নিগ্ধ মাধুর্যভরা একঝলক উদ্দীপনার সঙ্গে সে কথাগুলো বলল। 'আহ, আমি যে তোমাকে সাহায্য করছি, একথা ভেবে আমার যে কী আনন্দ!'

'সাহায্য, প্রিয়তমা। তোমাকেই সব কিছু করতে হবে। তুমি এত সুন্দরী, মনোরমা ও মনোহারিণী যে, তুমি সঙ্গে থাকলে আমি মাইনের ব্যাপারে বুড়ো দু-জনকে তাঁদের সর্বোচ্চ হারে রাজি করাতে পারব এবং কিছুতেই তাঁরা তা এড়াতে পারবেন না।'

তাঁর ধমনীর রক্ত বোধ হয় চঞ্চল হয়ে উঠল এবং তাঁর অনুপম চোখ দুটি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

'তুমি একটা দুষ্টু চাটুকার! তোমার কথায় এক বিন্দুও সত্য নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি

তোমার সঙ্গে যাব এবং তোমাকে এ-শিক্ষা দিতে চাই যে, অন্য লোক তোমার চোখ দিয়ে দেখুক—এটা তুমি আশা করতে পার না।'

আমার সন্দেহ কি দূর হল? আমার আস্থা কি ফিরে এল। এ থেকে সেটা বিচার করা যেতে পারে : গোপনে গোপনে আমার প্রথম বছরের বেতন বারশ পাউন্ড তুলেছিলাম! কিন্তু তাকে কিছু বলি নি। সেটা সে করে দিতে পারবে আশা করে রয়েছি।

বাড়ি ফেরার সময় সারাটা পথ আমি একটা অন্ধকারের মধ্যে ছিলাম। হেস্টিংস বকে যাচ্ছিল, আমি তার একবিন্দু শুনছিলাম না। যখন আমরা দু-জন আমার বৈঠকখানায় ঢুকলাম তখন আমার স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌখিনতা সম্পর্কে হেস্টিংস-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আমি নিজের মধ্যে ফিরে এলাম।

'রোস, আমি এখানে দাঁড়িয়ে একটু প্রাণ ভরে দেখে নিই। আহ্, এটা একটা প্রাসাদ একেবারে পুরোপুরি প্রাসাদ। এখানে যে-কোনো লোক কয়লার আগুন এবং নৈশ-আহার থেকে শুরু করে যে-কোনো জিনিস আশা করতে পারে। হেনরি, শুধু আমাকে একথাই বলে দিচ্ছে না যে, তুমি কত ধনী—আমাকে আরও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এবং আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি যে আমি কত গরিব, কত নিঃস্ব, কত পরাস্ত এবং সর্বস্বান্ত!'

সব গোল্লায় যাক। তার কথায় আমি চমকে উঠলাম। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তার কথায় আমি বুঝতে পারলাম আমার পায়ের তলায় রয়েছে একটা জ্বলন্ত অগ্নিগিরি এবং আমি তার ওপরের আধ ইঞ্চি পুরু আবরণের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আমি বুঝতে পারি নি যে, আমি স্বপ্ন দেখছি কি না। কিন্তু এটা ঠিক, নিজেকে আমি আসল ব্যাপারটা বোঝাবার এতটুকুও চেষ্টা করি নি। কিন্তু এখন, আগাগোড়া আমি দেনায় ডুবে আছি—আমার হাতে একটা পয়সাও নেই। একটা সুন্দরী মেয়ের সুখ-শান্তির ভার আমার ওপর! আমার সামনে কিছুই নেই—শুধু একটা মোটা বেতনের আশা। তাও আবার পূর্ণ না-ও হতে পারে। আমার মনে হল, আমি যেন একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছি। তার থেকে বাঁচবার কোনো ভরসা আমার নেই।

'হেনরি, তোমাকে দৈনিক আয়ের সামান্যতম একটু হলেও—'

'হায়, আমার দৈনিক আয়। নাও, এই ভালো, স্কচ খেয়ে নাও এবং মনকে উৎফুল্ল কর। এই নাও। অথবা—ও, না থাক, তুমিও ক্ষুধার্ত। বস এবং—।'

'আমার কিছুর দরকার নেই। আমি আজকাল খেতে পারি না। তবে আমি তোমার সঙ্গে মদ খাব, যতক্ষণ না আমি পড়ে যাই। এস!'

'ব্যারেল, ব্যারেল খাও? তোমাকে আমি তাই দেব। জিনও? হ্যাঁ, লয়েড, আম পেয়ালায় ঢালছি। তুমি তোমার গল্প শুরু কর।'

'আবার কী গল্প?'

'আবার? কী বলছ?'

'হ্যাঁ, আমি বলছি যে, তুমি কি সেটা আবার শুনতে চাইছ?'

'আমি কি আবার শুনতে চাচ্ছি? এটা একটা ধাঁধা। রাখ, আর ওগুলো খেয়ো না। তোমার আর দরকার নেই।'

'শোন হেনরি, তুমি আমাকে সত্যি ভয় পাইয়ে দিয়েছ। আসতে আসতে তোমাকে গল্পটা বলি নি?'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'আমি যদি কিছু শুনে থাকি, তবে আমার ফাঁসি হোক।'

BanglaInternet.com

'হেনরি, এটা খুব খারাপ কথা। আমাকে খুব পীড়া দিচ্ছে।'

'রাষ্ট্রদূতের ওখানে থাকতে তোমার কী হয়েছিল, বল তো?'

আবার সব কিছু আমার চোখের সমনে ভেসে উঠল। আমি নিজেকে ফিরে পেলাম।

'আমি পৃথিবীর সেরা মেয়েকে পেয়েছি—তাকে বন্দি করেছি।'

তক্ষুনি সে ছুটে এল এবং আমরা দু-জনে বারবার করমর্দন করতে লাগলাম।

আমি এত বেশি করে করমর্দন করলাম যে, হাতে ব্যথা ধরে গেল এবং তিন মাইল হেঁটে আসতে আসতে সে যে গল্প বলেছে, তার এক বিন্দুও না-শোনাতে সে কোনো অনুযোগ করল না। সে বসে পড়ল এবং ধৈর্যশীল লোকের মতো সমস্ত গল্পটা আবার আমাকে শোনাল। সংক্ষেপে তার কথাগুলো হচ্ছে এই : একটা বড় রকমের সুযোগ পেয়ে সে ইংলন্ড এসেছিল। পাউন্ড ও মুদ্রা এক্সটেনশন লেন-দেনের সে সুযোগ পেয়েছিল। দশলক্ষ ডলারের ওপর যা লেনদেন হবে, তা হবে তার নিজস্ব। সে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে, প্রতিটি পন্থাতেই চেষ্টা করেছে—কোনো চেষ্টারই সে কসুর করে নি এবং তার যত টাকা ছিল, তার প্রায় সবই সে এতে ব্যয় করে ফেলেছে। তার কথা শোনার মতো একজন মহাজনও সে পায় নি। আর একমাসের ভেতরই তার চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে। এক-কথায় সে সর্বস্বান্ত হয়েছে। কথাগুলো শেষ হওয়ার পরই সে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল :

'হেনরি, তুমি আমাকে বাঁচাতে পার, আমাকে রক্ষা করতে পার। পৃথিবীতে কেবল তুমিই আমাকে রক্ষা করতে পার। তুমি কি তা করবে? বল, তুমি কি আমায় বাঁচাবে?'

'কী করে? খুলে বল, কী করে তোমায় আমি বাঁচাতে পারি।'

'আমাকে দশলক্ষ ডলার এবং দেশে যাবার ভাড়া দাও। অস্বীকার কর না, হেনরি।'

ওর কথায় আমার বড় কষ্ট বোধ হল। প্রায় ওকে বলেই ফেলেছিলাম—'লয়েড, আমি নিজেই একজন ভিখেরি—কপর্দকহীন, দেউলে এবং দেনাগ্রস্ত।' কিন্তু হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মুখ চেপে রেখে নিজেকে শান্ত করলাম এবং একজন পুঁজিওয়ালা মহাজনের মতো, ব্যবসায়ীর মতো বললাম :

'আমি তোমাকে রক্ষা করব, লয়েড—'

'আহা, আমায় বাঁচালে হেনরি। তাহলে আমি সত্যিই রক্ষা পেয়ে গেছি। খোদা তোমার মঙ্গল করুন। হেনরি যদি কখনও—'

'আমাকে শেষ করতে দাও, লয়েড। আমি তোমাকে রক্ষা করব, তবে ঠিক ওভাবে নয়। তোমার এত কষ্ট স্বীকার এবং ঝুঁকি নেবার পর সেটা তোমার পক্ষে মঙ্গলকর হবে না। খনি কেনার আমার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়াও লন্ডনের মতো ব্যবসাকেন্দ্রে আমার মূলধন খাটানোর অসুবিধে হবে না। সেটাই আমি সব সময়ে চেয়েছি। আমি যা করব তা হচ্ছে—এই খনিটার ব্যাপারে আমার সব জানা আছে—এর অপরিমিত সম্পদের কথাও আমার জানা রয়েছে এবং তা আমি যে-কোনো লোকের কাছে হলফ করে বলতে পারি। তুমি আমার নাম ভাঙিয়ে খনির ভেতরের অংশটা নগদ ৩০ লক্ষ ডলারে বিক্রি করে ফেলতে পারবে। তারপর সমান অংশে আমরা সে টাকা ভাগ করে নেব।'

বিশ্বাস করবেন না, ও পাগলের মতো নাচতে লাগল। আমি ধরে না ফেললে আসবাবপত্রের ওপর পড়ে সে সব ভেঙে-চুরে ফেলত।

এরপর নিশ্চিন্ত আরামে সে সেখানে শরীর এলিয়ে দিল এবং শান্ত কণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল :

'তোমার নাম আমি ব্যবহার করতে পারি। তোমার নাম—চিন্তা করে দেখ! আহ্ কী

ভাগ্য! লন্ডনের সব বড় বড় ধনী যে আমাকে ছেঁকে ধরবে খনির ভেতরের সব জিনিসের জন্যে। আমি বড়লোক হয়ে গেছি! আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তোমাকে কিছুতেই ভুলতে পারব না, হেনরি!'

চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে গোটা লন্ডন শহর এই খবরে মুখর হয়ে উঠল, আমাকে কিছুই করতে হয় নি। দিনের পর দিন আমি ঘরে বসে থেকেছি এবং লোককে বলেছি :

'হ্যাঁ, আমি তাকে বলেছি, আমার কথা বলতে। লোকটাকে আমি চিনি, খনিটাও চিনি। তার চরিত্র সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে। আর খনির জন্যে যে দাম সে চাচ্ছে, তার চেয়ে তার সত্যিকারের মূল্য আরও অনেক বেশি।'

ইতিমধ্যে আমি আমার মনোরম সন্ধেগুলো রাষ্ট্রদূতের ভবনে পোর্শিয়ার সঙ্গে কাটিয়েছি। আমি তাকে খনি সম্বন্ধে একটা কথাও বলি নি। তাকে আবাক করে দেবার জন্যেই সে কথা বলি নি। আমরা দু-জনে কেবল বেতন সম্বন্ধে আলাপ করতাম। বেতন ও ভালোবাসার কথা ছাড়া আর কোনো কথাই আমাদের মধ্যে হত না। কখনও ভালোবাসার কথা, আবার কখনও বেতনের কথা। কখনও দুটো কথাই একসঙ্গে হত। রাষ্ট্রদূতের পত্নী ও কন্যা আমাদের ব্যাপারটিতে বেশ আগ্রহ দেখাতেন এবং আমাদের নানা বাধা-বিপত্তি থেকে রক্ষা করার জন্যে নানা ফন্দি-ফিকির বের করতেন। আমাদের ব্যাপারে রাষ্ট্রদূতকে নিঃসন্দেহ রাখার জন্যে তাঁর কাছে সব কথা তাঁরা গোপন করতেন। সত্যি, তাঁরা কত ভালো!

অবশেষে মাস শেষ হলে লন্ডন ও কাউন্টি ব্যাঙ্কে আমার নামে দশলক্ষ ডলার জমা হল। মেস্টিংসের নামেও জমা হল দশলক্ষ ডলার। যথাসাধ্য ভালো পোশাকে সজ্জিত হয়ে পোর্টল্যান্ড প্লেসে মালিকের বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি করে গেলাম। অবস্থা দেখে মনে হল, আমার শিকার ফিরে এসেছে। আমি রাষ্ট্রদূতের বাসায় গিয়ে আমার প্রেয়সীকে সঙ্গে নিলাম এবং মালিকের বাড়ির দিকে যেতে লাগলাম। পথে শুধু বেতনের কথাই বলতে লাগলাম। সে এতে উত্তেজিত এবং উদগ্রীব হয়ে পড়েছিল যে, তাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি বললাম :

'প্রিয়তমা, তোমাকে যেমনটা দেখাচ্ছে, তাতে তিন হাজার পাউন্ডের এক পেনি কম চাওয়াও আমার অপরাধ হবে।'

'হেনরি, হেনরি। তুমি আমাদের সর্বনাশ করবে।'

'ভয় পেয়ো না। তোমার চোখের মাধুর্য ঠিক রেখো এবং আমার ওপর বিশ্বাস রেখো। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

সুতরাং, সারা পথ তার সাহস বাড়িয়ে তোলাই ছিল আমার কাজ। সে একসময় অনুনয় করে আমায় বলল :

'মনে রেখো, আমরা যদি খুব বেশি বেতনের জন্য পেড়াপেড়ি করি তাহলে বেতন একেবারে নাও পেতে পারি। আর তাহলে জীবিকা উপার্জনের আর কোনো পথই খোলা থাকবে না। সে অবস্থায় আমাদের কী উপায় হবে, বল?'

সেই পরিচারকটিই আমাদের পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। সেখানে বুড়ো ভদ্রলোক দু-জন বসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা আমার সঙ্গে এই অশ্চর্য জীবটি, অর্থাৎ পোর্শিয়াকে সঙ্গে দেখে বিস্মিত হলেন। আমি বললাম :

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ আমার প্রেমিকা এবং ভবিষ্যৎ জীবন-সহচরী।'

আমি তাদের সঙ্গে পোর্শিয়াকে পরিচয় করিয়ে দিলাম এবং তাঁদের নাম বললাম।

BanglaInternet.com

তাঁদের নাম বলায় তাঁরা আশ্চর্য হন নি। কারণ, তাঁরা বুঝেছিলেন ডাইরেক্টরি থেকে নাম সংগ্রহ করার মতো জ্ঞান আমার আছে। তাঁরা আমাদের দু-জনকে বসতে বললেন এবং আমাদের সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করতে লাগলেন। পোর্শিয়ার সঙ্গে এমন সৌজন্যে দেখালেন যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তার অপ্রস্তুত ভাবটা কেটে গেল এবং সে খুব সহজ হয়ে উঠল। এরপর আমি বললাম :

'মহোদয়গণ,আমি এখন আমার বিবরণ পেশ করতে চাই।'

'আমরা শুনে খুশি হলাম, আমার মালিক বললেন। আমার ভাই অ্যাবেল ও আমি যে বাজি রেখেছি, সেটা এখন নিশ্চয়ই স্থির করতে পারি। তুমি যদি আমাকে জিতিয়ে থাক, তাহলে আমার দানপত্রের মধ্যে যে-কোনো একটা চাকরি তোমাকে দেব। তোমার কাছে সে দশলক্ষ পাউন্ডের নোটটা কি আছে?'

'এই যে সেটা।'—এই বলে নোটটা আমি তাঁর হাতে দিলাম।

'আমি জিতেছি!' তিনি জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন এবং উত্তেজনায় অ্যাবেলের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

'দেখছি, সে ঠিকভাবে—টিকে আছে এবং বাজিতে আমার হার হল। আমি কুড়ি হাজার পাউন্ড হারলাম। আমি কখনও এটা আশা করি নি এবং কখনও আমি এটা বিশ্বাস করতে পারতাম না।'

'আমার আরও কিছু বলবার আছে,' আমি বললাম, 'সেটা এক দীর্ঘ গল্প। পরে এসে আমি সারা মাসে যা কিছু ঘটেছে, তা আপনাদের এক-এক করে শোনাব। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, সেটা শোনার মতোই হবে। এখন এটা দেখুন।'

'কী ব্যাপার। এখানে দেখছি, দু-হাজার পাউন্ড জমা আছে। এটা কি তোমার?'

'হ্যাঁ, আমার। ত্রিশ দিনের জন্যে আপনারা আমাকে যে ধার দিয়েছিলেন, তার সদ্ব্যবহার করেই এটা করেছি। এ দিয়ে শুধু এইটুকু করেছি—কিছু জিনিসপত্র কিনেছি এবং নোটটি তার পরিবর্তে দিতে চেয়েছি।'

'এ তো খুব আশ্চর্যের কথা! একেবারে অবিশ্বাস্য!'

'কোনো ভাবনা নেই। আমি এটা প্রমাণ করব। প্রমাণ ছাড়া আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।'

এবার পোর্শিয়ার বিস্ময়ের পালা। বিস্ময়ে তার চোখ দুটো প্রসারিত হয়ে উঠল। আমার চোখের ওপর চোখ রেখে সে বলল :

'হেনরি, সত্যিই এটা কি তোমার টাকা? তুমি কি আমার কাছে কথাটা গোপন করেছ?'

'হ্যাঁ, প্রিয়তমা! কিন্তু আমি জানি, তুমি সেটা ক্ষমা করবে।'

ঠোঁট কুঁচকে সে বলল :

'অতটা নিশ্চিত হয়ো না। তুমি খুব দুষ্টু। তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়েছ।'

'বা রে, এ কিছুই না—এতে কিছু মনে কর না। এতে কিছু মনে করার নেই—দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোমার কাছে একটুখানি কৌতুক করেছি মাত্র। এবার চল, আমরা যাই।'

'অপেক্ষা কর। চাকরি? আমি তোমাকে একটা চাকরি দিতে চাই,'—আমার মালিক বললেন।

'সত্যি'!—আমি বললাম, 'এতে আমি বিশেষ কৃতার্থ হলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি আমি চাকরি চাই নে।'

'কিন্তু, তুমি আমার দানপত্র থেকে সবচেয়ে ভালো চাকরি বেছে নিতে পার।'

'এজন্যেও আপনাকে সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তাও চাই নে।'

'হেনরি, আমি তোমার জন্যে সত্যি লজ্জিত। বুড়ো ভদ্রলোককে যতটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত, তার অর্ধেকও তুমি দিচ্ছ না। বল তো তোমার হয়ে আমি সেটা করি।'

'নিশ্চয়ই, প্রিয়তমা! এর চাইতে ভালো কিছু পারলে—তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার।'

পোর্শিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে তখুনি আমার মালিকের কাছে এগিয়ে গেল। তাঁর কোলের ওপর বসল এবং বাহু দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে মুখে চুমো খেল। তখন বুড়ো ভদ্রলোক দু-জন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। কিন্তু আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি। সোজা কথায়, আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। পোর্শিয়া বলল :

'বাবা, সে বলেছে, তোমার দানপত্রে এমন একটা চাকরিও নেই, যেটা সে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি—'

'প্রিয়তমা, উনি কি তোমার বাবা?'

'হ্যাঁ, আমার স্নেহময় বাবা এবং তিনিই আমার সবচেয়ে প্রিয়। তুমি এখন নিশ্চয়ই বুঝেছ, বাবা ও চাচার তৈরি সমস্যায় পড়ে এবং আমাদের সম্বন্ধ না-জেনে রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে তুমি যখন গল্প বলছিলে, তখন আমি কেন অত হেসেছিলাম।'

কাজেই এখন আর বোকামি না করে সোজা কাজের কথায় এলাম।

'হ্যাঁ স্যার, আমি যা বলেছি, তা প্রত্যাহার করছি। আপনার কাছে একটিই চাকরি আছে এবং সেটা আমি গ্রহণ করতে পারি।'

'সে চাকরিটার নাম বল।'

'জামাই।'

'বেশ, বেশ, বেশ। কিন্তু তুমি ওই পদে কখনও চাকরি করে না থাকলে চাকরির চুক্তি যথার্থভাবে পালন করবে এমনি আশ্বাস দিতে পারবে না। সুতরাং—'

'পরীক্ষা করে দেখুন। আমি অনুরোধ করছি ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে পরীক্ষা করুন এবং যদি—'

'ও, এটা অতি সামান্য ব্যাপার। আচ্ছা, তুমি ওকে নিয়ে যাও।'

আমরা সুখি হলাম। আমাদের এ আনন্দের কথা বলার মতো ভাষা নেই আমার। দু-একদিন পরেই ব্যাঙ্কনোট-সংক্রান্ত আমার একমাসের সব ঘটনা এবং যেভাবে এ-কাহিনী শেষ হয়েছে, তা লন্ডনের সবাই জানতে পেরে বেশ কৌতুক বোধ করল।

আমার পোর্শিয়ার বাবা সেই বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ নোটটি ব্যাঙ্কে নিয়ে ভাঙালেন। ব্যাঙ্ক সেটা বাতিল করে দিয়ে তাঁকেই উপহার দিল। তিনি নোটটা বিয়েতে উপহার দিলেন এবং আমরা সেটা আয়নায় বাঁধাই করে আমাদের ঘরের সবচেয়ে ভালো জায়গায় চিরদিনের জন্য টাঙিয়ে রাখলাম। কারণ, এর বদৌলতেই আমি আমার পোর্শিয়াকে পেয়েছি। আর এটা না পেলে আমি লন্ডনে থাকতে পারতাম না, রাষ্ট্রদূতের বাসায় খেতে পারতাম না এবং পোর্শিয়ার সাথে কখনও আমার দেখা হত না। তাই আমি সব সময় বলি : হ্যাঁ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা দশলক্ষ পাউন্ডের একখানি নোট। এটা দিয়ে একটা জিনিস কেনা হয়েছে—কিন্তু এটা দিয়ে সে জিনিসটির দামের এক দশমাংশে মাত্র দেওয়া সম্ভব।'

রচনাকাল : ১৮৯৩

সে কি জীবিত না মৃত

১৮৯২ সালের মার্চ মাসটা আমি রিভিয়েরা-র মেন্টোন-এ কাটাচ্ছিলাম। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে মন্টিকার্লো এবং নাইস-এ সাধারণের জন্য যেসব সুখ-সুবিধা আছে, ব্যক্তিগতভাবে সেই সব সুখ-সুবিধা অবসর-যাপনের এই জায়গাটাতেও পাওয়া যায়। তার অর্থ, এখানে আছে প্রচুর রোদ, স্বাস্থ্যপ্রদ হাওয়া, আর উজ্জ্বল নীল সমুদ্র : অথচ মানুষের হৈ-হট্টগোল ও নানারকম পোশাকের পারিপাট্য এখানে চোখে পড়ে না। মেন্টোন শান্ত, সরল বিশ্রামস্থল; ধনী ও জাঁকজমকবিলাসীরা সেখানে যায় না। আমি বলতে চাই, ধনী লোকেরা সাধারণত সেখানে যায় না। মাঝে-সাঝে এক-আধজন ধনী মানুষ এসে পড়ে। সম্প্রতি সেই রকম একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে। তার পরিচয় কিছুটা গোপন রাখবার জন্য তাকে আমি স্মিথ বলে ডাকব।

একদিন হোটেল দ্য আংলে-র দ্বিতীয় প্রাতরাশের সময় সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল :

জলদি ! যে লোকটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তাকে লক্ষ করুন। তার সব বিবরণ টুকে নিন।

'কেন?'

'লোকটি কে জানেন?'

'হ্যাঁ। আপনি আসবার আগ থেকেই তিনি এখানে আছেন। লোকে বলে, তিনি লায়ন্স থেকে আগত একজন বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত, খুব ধনী, রেশমিবস্ত্র-প্রস্তুতকারক। আমার ধারণা, লোকটি এই পৃথিবীতে একেবারে একা, কারণ সব সময় তাকে বিষণ্ন ও স্বপ্নদর্শী বলে মনে হয়, কারও সঙ্গে কথা বলেন না। তার নাম বিয়োফিল ম্যাগ্‌নান।'

ভেবেছিলাম, এবার স্মিথ খুলে বলবে মঁসিয়ে ম্যাগ্‌নান-এর প্রতি তার এই অতি আগ্রহের কারণ কী; কিন্তু তার পরিবর্তে সে যেন একটা দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল এবং কয়েক মিনিটের জন্য আমার কাছ থেকে এবং বাকি পৃথিবীর কাছ থেকেও হারিয়ে গেল। মাঝে মাঝে চিন্তার সুবিধে হবে বলে চকচকে সাদা চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে লাগল, আর এদিকে প্রাতরাশ ক্রমেই ঠাণ্ডা হতে লাগল। অবশেষে বলল।

'না, একেবারেই হারিয়ে গেছে; কিছুতেই মনে করতে পারছি না।'

'কী মনে করতে পারছেন না?'

'হ্যান্স এন্ডারসনে-এর একটি ছোট্ট সুন্দর গল্প। একেবারেই ভুলে মেরে দিয়েছি। কিছুটা অংশ এই রকম : একটি শিশুর ছিল খাচায় বন্দী একটা পাখি। পাখিটাকে সে ভালোবাসে, কিন্তু কিছু না ভেবেচিন্তেই তাকে অবহেলা করে। পাখিটা গান গায়, কিন্তু কেউ তা শোনে না। কেউ সেদিকে মন দেয় না; যথাসময়ে পাখিটা ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হয়, তার গান বিষণ্ন ও দুর্বল হতে হতে এক সময় থেমে যায়—পাখিটা মারা যায়। শিশুটি আসে, দুঃখে তার মন কাতর হয়; তারপর চোখের জলে শোক করতে করতে সে তার সঙ্গীদের ডেকে এনে যথাযোগ্য জাঁকজমক ও দুঃখের সঙ্গে পাখিটাকে কবর দেয়। বেচারিরা জানতেও পারে না যে জীবিতকালে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে ও আয়েসে-আরামে

রাখতে চেষ্টা না-করে কবিদের না- খাইয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে তারপর তাদের সৎকারে ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কাজে যথেষ্ট টাকা-পয়সা খরচ করবার এই অপকর্মটি শুধু শিশুরাই যে করে তা নয়। এখন—'

সেদিন এই পর্যন্ত কথা হয়েই আলাপ শেষ হল। সন্ধে দশটা নাগাদ স্মিথের সঙ্গে দেখা হতেই সে আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল একসঙ্গে ধূমপান ও গরম স্কচ-হুইস্কি খাবে বলে। ঘরটা খুব আরামদায়ক। ভালো চেয়ার, উজ্জ্বল বাতি, ভালো অলিভ কাঠের খোলা আগুন। তার ওপর সোনায় সোহাগার মতো বাইরে থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের বিক্ষিপ্ত তরঙ্গগর্জন। দ্বিতীয় দফা স্কচ ও অনেকরকম অলস গুল্‌তানির পরে স্মিথ বলল : 'আমার ধারণা এতক্ষণে আমরা দুজনই প্রস্তুত—আমি একটা আশ্চর্য ইতিহাস বলতে, আর আপনি সে ইতিহাস শুনতে। অনেক বছর ধরে কথাটা গোপন রয়েছে—আমার ও অপর তিনজনের গোপন একটা কথা : এবার আমি সে গোপনতা ভাঙতে চলেছি। আপনি আরাম বোধ করছেন তো?'

'বলে যান।'

সে যা বলে গেল এই তার মর্মার্থ :

অনেক বছর আগে আমি ছিলাম একজন তরুণ শিল্পী—খুবই তরুণ—এখানে কিছু ছবি আঁকি, ওখানে কিছু ছবি আঁকি, এইভাবে ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে আরও দু-জন ফরাসি তরুণের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল; তারাও আমার মতো ঐ একই কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমরা ছিলাম যেমন সুখি তেমনই গরিব, অথবা যেমন গরিব তেমনই সুখি। ক্লদ ফেরে ও কার্ল বুলাঁজার—এই হল ছেলে দুটির নাম; বড়ই ভালো ছেলে দুটি; দারিদ্র্যকে দেখে মনের সুখে হাসতে পারে; সুখে-দুঃখে একই মনোভাব বজায় রাখতে পারে।

শেষ পর্যন্ত ব্রোতোঁ গ্রামে পৌঁছে আমরা গভীর গাড্ডায় পড়ে গেলাম, আর সেখানেই আমাদেরই মতো গরিব আর একটি শিল্পী আক্ষরিক অর্থেই আমাদের ক-জনকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাল—তার নাম ফ্রাঁসোয়া মিলেৎ—

'কী। বিখ্যাত ফ্রাঁসোয়া মিলেৎ?'

'বিখ্যাত? তখন সে আমাদের চাইতে বেশি বিখ্যাত ছিল না। এমন কি নিজের গ্রামেও তার কোনো খ্যাতি ছিল না। এতই গরিব ছিল যে শালগম ছাড়া আর কিছুই আমাদের খাওয়াতে পারে নি সে; এমন কি মাঝে মাঝে শালগমেরও অভাব ঘটত তার। আমরা চারজন হয়ে উঠলাম তার ঘনিষ্ঠ আর অত্যুৎসাহী বন্ধু। একসঙ্গে সাধ্যমতো ছবি আঁকতে লাগলাম আমরা; ছবির স্তূপের পর স্তূপ জমতে লাগল; কদাচিৎ তার এক-আধখানা বিক্রি হত। তবু একসঙ্গে বেশ কাটছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দশা একেবারে চরমে উঠত।

দুই বৎসরাধিক কাল এইভাবে চলল। অবশেষে একদিন ক্লদ বলল :

'দেখো ভাইরা, এতদিনে আমরা শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা?—একেবারে শেষপ্রান্তে। সকলেই আমাদেরকে আঘাত করতে উদ্যত—আমাদের বিরুদ্ধে সকলে একজোট। সারা গ্রাম ঘুরে এসেছি; যা বললাম তাই ঠিক। পাই-পয়সা পর্যন্ত সব ধার মিটিয়ে না-দিলে তারা আমাদের আর এক সেন্টিমও ধার দেবে না।'

আমরা বড়ই ঘাবড়ে গেলাম। প্রত্যেকের মুখই হতাশায় সাদা হয়ে গেল। বুঝতে পরালাম, আমাদের অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। অনেকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। অবশেষে মিলেৎ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল :

BanglaInternet.com

'আমার তো মাথায় কিছুই আসছে না—কিচ্ছু না। তোমরা কিছু বাতলাও না বাছাধনেরা।'

কোনো সাড়া নেই; অবশ্য বিষণ্ন নীরবতাকে যদি সাড়া বলা যায় তো আলাদা কথা। কার্ল উঠে দাঁড়াল; কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করল; তারপর বলল :

'বড়ই লজ্জার কথা! এই ক্যানভ্যাসগুলোর দিকে তাকাও; স্তূপের পর স্তূপ এমন সব ভালো ছবি ইওরোপের যে কেউ নিশ্চয়ই আঁকতে পারবে না। হ্যাঁ, ভ্রমণে রয়েছে এমন অনেক অপরিচিত লোকই এ-কথা বলেছে।'

'কিন্তু একটা ছবিও তো কেউ কেনে নি।' মিলেৎ বলল।

'তা না কিনুক, একথা তারা বলেছে। আর কথাটা সত্যিও। ঐ যে তোমার 'দেবদূত', ওটার দিকে তাকাও। কেউ কি বলবে যে—'

'আঃ, কার্ল—আমার ঐ 'দেবদূত'-এর দাম উঠেছিল মাত্র পাঁচ ফ্রাঁ।'

'কখন?'

'কে দিতে চেয়েছিল?'

'কোথায় সে?'

'দামটা নাও নি কেন?'

'থাম—সকলে একসঙ্গে কথা বল না। ভেবেছিলাম লোকটা আরও বেশি দেবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল—তাকে দেখেই কথাটা বিশ্বাস হয়েছিল—তাই আমি আট ফ্রাঁ চেয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'সে বলল পরে আসবে।'

আমি জানি পাঁচ ফ্রাঁতে তক্ষুনি ওটা না-বিক্রি করা আমার ভুল হয়েছিল। আর আমিও কেমন যেন বোকা ছিলাম। বাপুরা, আমি তো ভালো বুঝেই দামটা একটু বেশি চেয়েছিলাম।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমরাও তা জানি; মনটা তো তোমার ভালোই। কিন্তু দেখো, আবার যেন বোকামি কর না।'

'আমি? এখন যদি কেউ এসে ওটার জন্য একটা বাঁধাকপিও দিতে চায় তাও দিয়ে দেব।'

'একটা বাঁধাকপি! আঃ ওই নামটা আর কর না তো—আমার জিভে জল আসছে। আরও সামান্য কোনো জিনিসের কথা বল।'

কার্ল বলল, 'বাছারা, এই ছবিগুলোতে কি গুণের কমতি আছে? আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'না'।

'এগুলো কি খুব উঁচুদরের ছবি নয়? এ-প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'হ্যাঁ।'

'এতই বড় আর উঁচুদরের জিনিস এগুলো যে, কোনো বিখ্যাত লোকের নাম যদি আমরা এদের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারি তাহলে প্রচণ্ড দামে এগুলি বিক্রি হয়ে যাবে, নয় কি?'

'নিশ্চয়, এতে কোনো সন্দেহই নেই।'

'না, ঠাট্টা নয়, কথাটা সত্যি কি না?'

'নিশ্চয়ই, আমরাও ঠাট্টা করছি না। কিন্তু তাতে হলটা কী? তাতে আমাদের কী আসে যায়?'

'আসে-যায় কমরেডগণ—এইসব ছবির সঙ্গে আমরা একটি বিখ্যাত নাম জুড়ে দিলে অনেক কিছুই এসে যায়।'

আমাদের আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কার্ল-এর দিকে তাকাল। এটা আবার কী রকমের ধাঁধা? একটা বিখ্যাত নাম ধার পাওয়া যাবে কোথায়? আর সেটা ধার করবেই বা কে?

কার্ল বসে পড়ে বলল :

'এবার আমি একটা খুব গুরুতর প্রস্তাব করতে যাচ্ছি। আমি মনে করি, ভিক্ষাবৃত্তির হাত থেকে আমাদের বাঁচবার এটাই একমাত্র উপায়। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের চেষ্টা সফল হবেই। মানবেতিহাসের বহুসংখ্যক দীর্ঘপ্রতিষ্ঠিত ঘটনার ওপরেই আমার এই মতামত প্রতিষ্ঠিত। আমি বিশ্বাস করি, এই পরিকল্পনা আমাদের সকলকেই ধনী করে তুলবে।'

'ধনী! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?'

'আদৌ না।'

'হ্যাঁ, হয়েছে। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ধনী হতে হলে এসব একেকটা ছবির দাম কত হওয়া উচিত বল তো?'

'একলাখ ফ্রাঁ এবং আমরা তা পাবও।'

'সত্যি ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, তাই কার্ল, দুঃখ-কষ্ট সইতে না পেরে বোধ হয়....'

'কার্ল, একটা বড়ি খেয়ে সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়।'

'তার আগে ওর মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও—তার পরে—'

'না, ব্যান্ডেজ বাঁধা উচিত ওর পায়ে; আমি লক্ষ করেছি—বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই ওর মাথার গোলমাল চলছে।' অত্যন্ত কঠোর স্বরে মিলেৎ বলে উঠল, 'চুপ কর। বেচারাকে তার বক্তব্য বলতে দাও। বল হে বাপু, তোমার পরিকল্পনা বুঝিয়ে বল কার্ল। ব্যাপারটা কী?'

'আচ্ছা, তাহলে প্রথমেই ভূমিকাস্বরূপ ইতিহাসের একটা সত্যকে তোমরা লক্ষ কর : অনেক মহৎ শিল্পীর সৃষ্টিকর্মই তার অনাহারে মৃত্যু ঘটবার আগে কখনও স্বীকৃতি লাভ করে নি। এটা এত বারবার ঘটেছে যে এর ওপর ভিত্তি করে আমি একটা সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি। নিয়মটা হল : প্রতিটি অজ্ঞাত ও অবহেলিত মহৎ শিল্পীর কীর্তিই একদিন অবশ্য স্বীকৃতি পাবে এবং তাঁর মৃত্যুর পর ছবির দাম চড়বে অনেক উঁচুতে। আমার পরিকল্পনা হল : আমরা ভাগ্যপরীক্ষা করব—আমাদের একজনকে অবশ্যই মরতে হবে।'

কথাগুলো এতই শান্ত ও অপ্রত্যাশিতভাবে বলা হল যে আমরা খুশিতে লাফিয়ে উঠতেও ভুলে গেলাম। তারপর শুরু হল সমস্বরে নানা রকমের উপদেশ বর্ষণ—ডাক্তারি উপদেশ—কার্লের মাথার ব্যামোকে কী করে সারাতে হবে তার বিভিন্ন পরামর্শ। কিন্তু কার্ল সেই হৈ চৈ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল, তারপর তার পরিকল্পনার কথা বলে যেতে লাগল।

হ্যাঁ, অন্য সবাইকে এবং নিজেকে বাঁচাতে আমাদের একজনকে মরতেই হবে। এ নিয়ে আমাদের ভাগ্য-পরীক্ষা করতে হবে। যার নাম উঠবে সেই হবে বিখ্যাত শিল্পী এবং ধনী, আর আমরা অন্য তিনজন হব কেবল মাত্র ধনী। চুপ কর, এখন চুপ কর—আমি যা বলছি, সব জেনে বুঝেই বলছি। যাকে মরতে হবে আগামী তিনমাস ধরে সে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ছবি এঁকে যাবে, যতদূর সম্ভব ছবির পুঁজি বাড়াবে—শুধু ছবিই নয়, রেখাচিত্র, স্টাডি, স্টাডির অংশ, প্রত্যেকটির ওপর ডজনখানেক ব্রাশের টান—সেগুলোকে অবশ্যই অর্থহীন হতে হবে, কিন্তু ছবিতে স্বাক্ষরিত তার নামের একটা বৈশিষ্ট্য তাতে থাকবে; দিনে এরকম অন্তত পঞ্চাশটা আঁকতে হবে তাকে। প্রত্যেকটাতেই তার সহজবোধ্য কিছু বৈশিষ্ট্য বা

banglainternet.com

রীতি-পদ্ধতির প্রকাশ থাকবে—তোমরা তো জান সে সবেরই বিক্রি হয় সবচেয়ে বেশি—কোনো মহান শিল্পীর মৃত্যুর পর সেগুলিই তো অবিশ্বাস্য রকমের মোটা দামে বিক্রি হয়ে পৃথিবীর সব যাদুঘরে সংগৃহীত হয়ে থাকে। সেরকম টনটন শিল্পকর্ম আমাদের হাতে মজুত রাখতে হবে! ইতিমধ্যে আমরা বাকি ক-জন মুমূর্ষুকে সেবা করতে, প্যারিসে ও অন্য জায়গায় ছবির ক্রেতাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার কাজে ব্যস্ত থাকব—অর্থাৎ আসন্ন ঘটনার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব; তারপর সবকিছু ঠিক ঠিক মতো ব্যবস্থা হয়ে গেলেই মৃত্যুর খবরটা সর্বত্র ছড়িয়ে দেব এবং ঘটা করে একটা শোকযাত্রার আয়োজন করব। কী, এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তো সবাই ভালোভাবে?'

'না-না; অন্তত সবটা—'

'সবটা বুঝতে পার নি, এই তো? আসলে আমাদের কেউ মারা যাবে না; শুধু নাম পাল্টে উধাও হয়ে যাবে; একটা নকল শবাধারকে আমরা কবর দেব, তাঁর জন্য কাঁদব, আর সমস্ত জগৎ আমাদের সহায় হবে। আর আমি—'

তাকে কথা শেষ করতেও দেওয়া হল না। সকলেই সমর্থনসূচক উল্লাসধ্বনিতে ফেটে পড়ল; লাফিয়ে উঠে ঘরময় নেচে-কুঁদে একে অপরের গলা জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই মহান পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কথা বললাম; এমন কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা পর্যন্ত ভুলে গেলাম। শেষ পর্যন্ত সবকিছুরই সন্তোষজনক ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর ভাগ্যপরীক্ষা করা হল এবং তাতে মিলেৎ নির্বাচিত হল—অর্থাৎ তথাকথিত মৃত্যুর জন্য নির্বাচিত হল।

পরদিন খুব সকালে প্রাতরাশ সেরেই আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম—অবশ্যই পায়ে হেঁটে। প্রত্যেকের সঙ্গে মিলেৎ-এর ডজনখানেক ছবি—উদ্দেশ্য সেগুলোর বিক্রির ব্যবস্থা করা। কার্ল এর লক্ষ্য প্যারিস—আসন্ন মহাদিবস উপলক্ষে মিলেৎ-এর খ্যাতিকে গড়ে তোলার কাজ সে শুরু করবে সেখানে। ক্লদ ও আমি আলাদাভাবে ফ্রান্সের দূর দূর অঞ্চলকে বেছে নিলাম।

কত সহজে ও আরামে আমরা যে আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেলাম সে-কথা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। কাজ শুরু করবার আগে দু-দিন একটানা হাঁটলাম আমরা। তারপর একটা বড় শহরের উপকণ্ঠস্থ একটা ভিলার স্কেচ করতে শুরু করে দিলাম—দোতলার বারান্দায় বাড়ির মালিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, তাই। ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে মালিক নেমে এলেন—আমি জানতাম তিনি আসবেন। তাঁর আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলবার জন্য আমি দ্রুত কাজ করে যেতে লাগলাম। আমার ছবি আঁকার দক্ষতা দেখে মাঝে মাঝে তার মুখ থেকে প্রশংসার বাণী বেরিয়ে আসতে লাগল। ক্রমে একান্ত উৎসাহের সঙ্গে একসময় তিনি বলেই বসলেন যে, আমি সন্দেহাতীতভাবে একজন মহৎ শিল্পী।

ব্রাশটা রেখে দিয়ে ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মিলেৎ-এর আঁকা একখানা ছবি বের করে এক কোণে লেখা নামটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, সগর্বে বললাম :

'এ-স্বাক্ষরটা আপনি নিশ্চয় দেখেছেন? দেখুন, তার কাছেই আমার শিক্ষা-দীক্ষা। কাজেই আমার আঁকায় যে অল্পবিস্তর কিছু পারদর্শিতার ছাপ থাকবে তাতে আর সন্দেহ কী!'

লোকটি অপরাধীর মতো বিব্রত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। আমি দুঃখের সঙ্গে বললাম :

'আপনি ফ্রাঁসোয়া মিলেৎ-এর স্বাক্ষর চেনেন না—একথা নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বেস করতে

বলবেন না।'

স্বাক্ষরটা তিনি সত্যি চিনতেন না। কিন্তু এমন সকৃতজ্ঞ লোক বুঝি আর হয় না। তিনি বলে উঠলেন :

'না, না! আরে, এটা যে দেখছি সত্যি সত্যি মিলেৎ-এর স্বাক্ষর। জানি না এতক্ষণ কোন্ কথা ভাবছিলাম। এ-স্বাক্ষর তো আমি অনেকদিন থেকেই চিনি।'

তারপরেই তিনি ছবিটা কিনতে চাইলেন; কিন্তু আমি বললাম, ধনী না-হলেও অতটা গরিব আমি নই। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আটশ ফ্রাঁ দামে ছবিটা তাঁর কাছে বিক্রি করলাম।

'আটশ!'

হ্যাঁ। মিলেৎ হয় তো শুয়োরের মাংসের চপের বদলেই ওটা বেচে দিত। হ্যাঁ, ঐ ছোট ছবিটার জন্য আমি পেলাম আটশ ফ্রাঁ। আহা, আজ যদি আশি হাজার দিয়েও ছবিটা ফেরৎ পেতাম। কিন্তু সে দিন চলে গেছে, লোকটির বাড়ির একটা সুন্দর ছবি এঁকে দশ ফ্রাঁ দামে সেটা তাকে দিতে চাইলাম, কিন্তু যেহেতু আমি এত বড় একজন গুরুর ছাত্র সেজন্য অত অল্প দামে তিনি ওটা নিতে রাজি হলেন না; ফলে ওটার জন্য পেলাম একশ ফ্রাঁ। সঙ্গে সঙ্গে আটশ ফ্রাঁ মিলেৎ-কে পাঠিয়ে দিয়ে পরদিন আবার যাত্রা শুরু করলাম।

কিন্তু এবার আর পায়ে হেঁটে নয়। গাড়িতে চেপে। সেই থেকে গাড়ি চেপেই চলাফেরা করে আছি। প্রতিদিন একখানি মাত্র ছবি বিক্রি করি; কখনও দু-খানা বিক্রির চেষ্টাও করি না। ক্রেতাকে সব সময়ই বলি :

'ফ্রাঁসোয়া মিলেৎ-এর ছবি বিক্রি করাই তো আমার পক্ষে বোকামি, কারণ মানুষটি আর তিনমাসও বাঁচবেন না, এবং একবার তিনি মারা গেলে এ-ছবিটা তো এর হাজার গুণ টাকা দিলেও মিলবে না।'

এই ছোট ঘটনাকে যতদূর সম্ভব প্রচার করে বেড়াতে লাগলাম আমরা এবং এইভাবে সেই পরম লগ্নের জন্য জগদ্বাসীকে প্রস্তুত করে তুললাম। ছবিগুলো বিক্রি করাবার সব কৃতিত্বই আমার—কারণ এই ফন্দিটা আমিই বের করেছিলাম। শেষের যে-রাতে আমরা পরিকল্পনা মতো অভিযানে নামতে যাচ্ছি সেই সময়ই এক প্রস্তাবটা আমি সকলের সামনে রাখি এবং আমরা তিনজনই একমত হই যে অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করবার আগে এই ব্যবস্থাটাকে ভালো রকম পরীক্ষা করে দেখা উচিত। কিন্তু তিন জনের বেলায়ই ফন্দিটা খুব কাজে লেগে যায়। আমাকে পায়ে হাঁটতে হয়েছে মাত্র দু-দিন; ক্লদও হেঁটেছে মাত্র দু-দিন। বাড়ির এত কাছে মিলেৎকে খ্যাতিমান করে তোলার ব্যাপারে আমাদের দু-জনের মনেই যথেষ্ট ভয় ছিল; কিন্তু কার্ল হেঁটেছিল মাত্র অর্ধেক দিন—আর তারপর থেকেই সে চলাফেরা করেছে ডিউকের মতো।

মাঝে মাঝেই কোনো গ্রাম্য সংবাদপত্রের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত; তার সহায়তায় কাগজে একটা সংবাদও ছাপার ব্যবস্থা করে ফেলতাম আমরা। সে-সংবাদে একজন নূতন শিল্পীকে আবিষ্কারের কথা থাকত না, থাকত ফ্রাঁসোয়া মিলেৎ-এর সর্বজন পরিচিতির ঘোষণা কোনো সংবাদেই তার কোনো প্রশংসার কথা লেখা হত না, লেখা হত এই 'শিল্পগুরু'র স্বাস্থ্য সম্পর্কে মাত্র একটি কথা—কখনও আশার কথা, কখনও নৈরাশ্যের, কিন্তু সবসময়ই তার সঙ্গে মেশানো থাকত চরম অবস্থার জন্য আতঙ্কের কথা। সংবাদপত্রের সেই অনুচ্ছেদগুলিকে দাগ দিয়ে আমরা পাঠিয়ে দিতাম মিলেৎ-এর ছবি যারা আমাদের কাছ থেকে কিনেছে তাদের ঠিকানায়।

কার্ল অচিরেই প্যারিসে উপস্থিত হয়ে বেশ ভালো হাতে কাজ গুছিয়ে ফেলেছিল।

সংবাদদাতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে মিলেৎ-এর স্বাস্থ্যের সংবাদ ইংল্যান্ড, ইওরোপ, আমেরিকা ও পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারের ব্যবস্থা করে ফেলল। কাজের শুরু হবার ছ-সপ্তাহের মধ্যেই আমরা তিনজন প্যারিসে মিলিত হয়ে কাজে বিরতি টানলাম এবং মিলেৎ-এর কাছে নতুন করে ছবি পাঠাতে নির্দেশ দিলাম। বাজার বেশ চড়েছে, একেবারে সরগরম অবস্থা। তাই ভাবলাম, আর অপেক্ষা না-করে অবিলম্বে মোক্ষম আঘাতটা হানা দরকার। তাই মিলেৎকে লিখে দেওয়া হল, সে যেন শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুকিয়ে হাড়সর্বস্ব হয়ে যায়, কারণ আমরা চাই সে দশ দিনের মধ্যেই মারা যাক।

টাকাকড়ি গুণে দেখলাম, তিনজনে মিলে আশিখানি ছোট ছবি ও স্টাডি বিক্রি করেছি এবং তার জন্য পেয়েছি ঊনসত্তর হাজার ফ্রাঁ। সর্বশেষ ছবিখানি বিক্রি করেছে কার্ল এবং মোক্ষম দাঁও মেরেছে। দেবদূত ছবিটা সে বেচেছে বাইশ শ ফ্রাঁ দামে।

মিলেৎ-এর বাজার-দর তখন কতখানি উঠেছে ভেবে দেখুন—অবশ্য তখনও আমরা বুঝতে পারি নি যে এমন একটা দিন আসছে যখন ঐ ছবিটা পাবার জন্য সারা ফ্রান্সে লড়াই লেগে যাবে এবং কোনো অপরিচিত লোক নগদ পঞ্চাশ হাজার দিয়ে ওটা কিনে নেবে।

কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলবার আগের রাতে আমরা শ্যাম্পেন সহযোগে নৈশভোজন সমাধা করলাম। পরদিন ক্লদ ও আমি জিনিসপত্র বেঁধেছেদে শেষের কটা দিন মিলেৎ-এর সেবাশুশ্রূষার জন্য চলে গেলাম। অহেতুক কৌতূহলী লোকজনদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে প্যারিসে কার্ল-এর কাছে দৈনিক বুলেটিন পাঠাতে লাগলাম, যাতে সে বিভিন্ন মহাদেশের সংবাদপত্রের মারফত অপেক্ষমাণ পৃথিবীর কাছে সংবাদ নিয়মিত পৌঁছে দেওয়ার কাজ চালিয়ে যেতে পারে। অবশেষে এল শেষের সেই দুঃখের দিনটি ; সৎকার-অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার দিন। সৎকার অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য কার্লও যথাসময়ে এসে হাজির হল। ফ্রাঁসোয়া মিলেৎ-এর সেই বিরাট সৎকার অনুষ্ঠানের কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে।

পৃথিবী জুড়ে সে কী হৈ চৈ! দুই পৃথিবীর সব বড় বড় লোক এসে সেই শেষকৃত্যে তাঁদের শোক নিবেদন করেছিল। আমরা চার অত্যাগসহন বন্ধুই শবাধার বয়ে নিয়ে গেলাম; অন্য কাউকে হাত লাগাতে দিলাম না। সেটা খুবই সতর্কতার সঙ্গে করতে হল। কারণ শবাধারের ভেতরে একটা মোমের মূর্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কাজেই অন্য যে-কোনো শবাধারবাহকই এত কম ওজনের শবাধার দেখলে সন্দেহ প্রকাশ করে বসত। হ্যাঁ আমরা সেই পুরনো চারজনই—যারা একদা দুঃখের দিনে স্বেচ্ছায় একসঙ্গে সে দুঃখকে ভাগ করে ভোগ করেছি, আর আজ যে দুঃখ চিরদিনের মতো আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে—সেই পুরনো চারজনই শবাধারটা বহন—

'কোন চারজন?'

'আমরা চারজন—কারণ মিলেৎ নিজেও শবাধার বহন করেছিল। বুঝতেই পারছেন, সে ছিল ছদ্মবেশে—একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের পরিচয়ে।'

'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য হলেও সত্য। আচ্ছা, তারপর থেকেই ছবির দাম কীভাবে বাড়তে লাগল সে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। আর টাকা? অত টাকা নিয়ে কী করব তাই ভেবে পেতাম না। আজ প্যারিসে এক ভদ্রলোকের নিজেরই আছে সত্তরখানা মিলেৎ-এর আঁকা ছবি। সে আমাদের দিয়েছিল কুড়ি লক্ষ ফ্রাঁ। আর যে ছ-টা সপ্তাহ, আমরা পথেপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন মিলেৎ ঘরে বসে যে ঝুড়ি-ঝুড়ি স্কেচ ও স্টাডি করেছিল, আজকাল আমরা সেগুলোকে কী দামে যে বিক্রি করি—অবশ্য যখনই কোনো একটাকে আমরা হাতছাড়া করতে রাজি

হই—সেই কথা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।'

'এক আশ্চর্য ইতিহাস—একেবারেই আশ্চর্য!'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।'

'আর মিলেৎ-এর কী হল?'

'কথাটা গোপন রাখতে পারবেন তো?'

'তা পারব।'

'আজ খাবার ঘরে যে লোকটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম তার কথা মনে আছে? সেই হল ফ্রাঁসোয়া মিলেৎ।'

'মহান—'

'স্কট। হ্যাঁ। এই একটি ক্ষেত্রেই কেবল জনসাধারণ একটি প্রতিভাকে না-খেয়ে মরতে দেয় নি, আর যে পুরস্কার ছিল তার প্রাপ্য, তাই দিয়ে ভরিয়েছে অন্যের পকেট। অন্তত এই গায়ক পাখিটির বেলায় তার মধুর সঙ্গীতে কান না-দিয়ে তার মৃত্যুর পর এক বিরাট সৎকার-অনুষ্ঠানে জাঁকজমক করে তার দাম দেওয়া হয় নি। আর সে-ব্যবস্থাটা আমরাই করেছিলাম।'

রচনাকাল : ১৮৯৩

Banglainternet.com

একটি আশ্চর্য স্বপ্ন

[একটি নীতিবাক্যসহ]

গত রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। মনে হল, আমি যেন দরজার সিঁড়িতে [কোনো বিশেষ শহরে হয় তো নয়] বসে স্মৃতিচারণা করছি ; তখন রাত প্রায় বারটা কি একটা। আবহাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ ও সুন্দর। বাতাসে কোনো মানুষের শব্দ শোনা যাচ্ছে না, এমন কি পায়ের শব্দও নয়। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে-আসা কোনো কুকুরের ফাঁকা ঘেউ ঘেউ ডাক এবং ততধিক দূর থেকে আসা তার অস্পষ্টতর জবাব ছাড়া আর কোনো শব্দই সেই মৃত্যুস্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করছে না। এমন সময় শুনতে পেলাম পথ দিয়ে যেন একটা কঙ্কালের খট্‌খট্ আওয়াজ এগিয়ে আসছে; ভাবলাম, কোনো নৈশ গায়কদলের কাঠের খঞ্জনির শব্দ। একমিনিট পরেই টুপি-পরা এবং শতচ্ছিন্ন ছাতা-পরা শবাবরণে অর্ধেক শরীর ঢাকা একটা লম্বা কঙ্কাল বড় বড় পা ফেলে আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে তারার অস্পষ্ট ধূসর আলোয় অদৃশ্য হয়ে গেল। তার ঘাড়ে একটা কীটে-কাটা শাবাধার ও হাতে একটা বান্ডিল। খট্‌খট্ শব্দটা যে কিসের সেটা বুঝতে পারলাম ; হাঁটবার সময় হাড়ের জোড়গুলোতে ঠোকাঠুকি লেগে এবং দু-পাশের পাঁজরের ওপর কনুই ঠুকে যাওয়াতেই শব্দটা হচ্ছিল। বলতে পারি বিস্ময় বোধ করেছিলাম। চিন্তা-ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে এই অশরীরী আবির্ভাব কিসের হতে পারে সেটা বুঝে উঠবার আগেই আরও একজনের আসার শব্দ পেলাম—কারণ সেই খট্‌খট্ শব্দটা আমার চেনা হয়ে গেছে। একটা শবাধারের দুই-তৃতীয়াংশ তার কাঁধে, আর পায়ের ও মাথার দিককার কিছু তক্তা তার বগলে। খুবই ইচ্ছে হল তার মাথার ঢাকনার নিচ দিয়ে তাকিয়ে তার সঙ্গে কথা বলি, কিন্তু যেতে যেতে চোখের গর্তের ভেতর থেকে যেভাবে সে তাকাল এবং বেরিয়ে-আসা দাঁতের পাটি যে-ভাবে দেখাল তাতে মনে হল তাকে না-আটকানোই ভালো। সে চলে যেতে-না-যেতেই আবার সেই শব্দ কানে এল এবং আবছা আলোর ভেতর থেকে আর-একটি কঙ্কাল বেরিয়ে এল। মাথায় একটা ভারি কবরের পাথর বয়ে আনতে সে একেবারে কুঁজো হয়ে পড়েছে ; দড়িতে বাঁধা একটা নোংরা শবাধারকে সে টেনে নিয়ে চলেছে। আমার কাছে পৌঁছে সে দু-এক মুহূর্তের জন্য স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল; তারপর ঘুরে আমার কাছে এসে বলল :

'এটাকে একটু নামিয়ে দেবে?'

কবরের পাথরটাকে নামিয়ে মাটিতে রাখতে গিয়ে দেখলাম তার ওপর নাম লেখা রয়েছে 'জন বাক্সটার কপম্যান হার্স্ট', আর মৃত্যুর তারিখ লেখা রয়েছে 'মে, ১৮৩৯'। মৃত লোকটি শান্তভাবে আমার পাশে বসে পড়ল এবং হাত তুলে কপোলটা মুছল—আগেকার অভ্যাসবশতই কাজটা সে করল, কারণ তার হাত থেকে কোনো ঘাম ঝরতে দেখলাম না।

বাকি শবাবরণটুকু টেনে নিয়ে চিন্তিতভাবে চোয়ালটি হাতের ওপর রেখে সে বলল, 'খুব খারাপ, খুব খারাপ।' তারপর বাঁ পা-টা হাঁটুর ওপর তুলে শবাধারের ভেতর থেকে একটা মরচে-পড়া নখ বের করে গোড়ালির হাড়টাকে অন্যমনস্কভাবে চুলকোতে লাগল।

'কী খুব খারাপ বন্ধু?'

'ওঃ, সবকিছু, সবকিছু। মনে হয় না-মরাই ছিল ভালো।'

'আমাকে অবাক করলে তো। এ-কথা বলছ কেন? কোনো ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে কি? কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার? এই শবাবরণ—এই ছেঁড়া কম্বলের দিকে তাকিয়ে দেখ। কবরের পাথরটাকেও দেখ। সব ভেঙে-চুরে গেছে। এই লজ্জাজনক পুরনো শবাধারটা দেখ। চোখের সামনে একটা লোকের সব সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর জিজ্ঞেস করছ, ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে কিনা? আগুন আর গন্ধক!'

আমি বললাম, 'শান্ত হও, এটা খুবই খারাপ—নিশ্চয় খারাপ। তবে এ-পরিস্থিতিতে এসব জিনিস নিয়ে তুমি যে মাথা ঘামাবে তা ভাবতে পারি নি।'

'দেখ প্রিয় মহাশয়, মাথা আমি সত্যি ঘামাচ্ছি। আমার দেমাগে আঘাত লেগেছে—বলতে পার, আমার আরাম বিঘ্নিত হয়েছে—ধ্বংস হয়েছে যদি অনুমতি কর তো আমার ইতিহাস তোমাকে বলব—এমনভাবে বলব যাতে তুমি বুঝতে পার,' মাথায় আবরণটাকে ঠেলে তুলে দিয়ে চোরি কঙ্কাল কথাগুলো বলল ।

'বলে যাও', আমি বললাম।

'এখান থেকে একটা কি দুটো ব্লক আগে এই রাস্তারই একটা পুরনো লজ্জাজনক কবরখানায় আমি থাকি—এই যা, ঠিক ভেবেছিলাম। উপাস্থিটা সরে যাবে। নিচের দিক থেকে তিন নম্বর পাঁজরটা বঙ্ক, তোমার কাছে কোনো দড়ি থাকলে তা দিয়ে যদি আমার শিরদাঁড়ার সঙ্গে ওটা বেঁধে দাও, অবশ্য রুপোর তার হলেই ভালো হয়। কারণ, ঘসে-মেজে রাখলে সেটা অনেকদিন টেকে আর দেখতেও ভালো দেখায়—ভাব তো, শুধুমাত্র উত্তরপুরুষের উদাসীনতা ও অবহেলার ফলে এইভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া, ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়া কি খুব সুখের কথা!' বেচারা ভূতটা এমনভাবে দাঁত কড়মড় করে উঠল যে আমার গা গুলিয়ে উঠল, আমি কাঁপতে লাগলাম—কঙ্কালের গায়ে মাংস বা চামড়া না-থাকায় ব্যাপারটা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল। 'ঐ পুরনো কবরখানায় আমি থাকি ; তিরিশ বছর ধরে আছি। আমি বলছি, আজ সবকিছুই বদলে গেছে। প্রথম যেদিন আমার এই পুরনো শ্রান্ত দেহটাকে ওখানে রেখেছিলাম, সেদিন দুশ্চিন্তা, দুঃখ-উদ্বেগ, সন্দেহ ও ভয়ের হাত থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি পেয়ে গেলাম, এই মধুর চিন্তায় উজ্জীবিত হয়ে একটা লম্বা ঘুমের আশায় শরীরটাকে টান-টান করে দিয়েছিলাম, আর শুয়ে শুয়ে কান পেতে পরম সন্তোষের সঙ্গে শুনেছিলাম সমাধি-খননকারীর কাজের শব্দ, শবাধারের ওপর প্রথম মাটি ফেলা শুরু করে ক্রমেই অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতরভাবে আমার নতুন বাসভবনের ছাঁদটাকে পিটিয়ে সমান করে দেওয়ার শব্দ পর্যন্ত—আঃ! সে কী আরাম! হায় রে! আজ রাতে যদি সে-রকমটা আর একবার ঘটত!' আমার স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায়ই একটা হাড়-সর্বস্ব হাত সশব্দে আমাকে একটা থাপ্পড় মেরে বসল।

'হ্যাঁ মশাই, তিরিশ বছর আগে আমি ওখানে শুয়েছিলাম, আর বেশ সুখেই ছিলাম। কারণ তখন এটা ছিল গ্রামাঞ্চল—বড় বড় গাছপালা ছিল, ফুল ছিল, বাতাস ছিল, অলস বাতাসে পাতায় পাতায় মর্মরধ্বনি উঠত; কাঠবেড়ালিরা আমাদের ওপরে ও চারপাশে ঘুরে বেড়াত; কীটপতঙ্গরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত; আর সেই স্তব্ধ নৈঃশব্দকে পাখিরা গানে গানে ভরে দিত। আহা, মৃত্যুর পরে দশটি বছর তখন কী আরামেই কেটেছে! সব কিছুই মনোরম। প্রতিবেশীরাও ছিল ভালো; যে-সব মৃত ব্যক্তি আমার কাছাকাছি থাকত তারা সকলেই ছিল শহরের সেরা পরিবারের লোক। উত্তরপুরুষরা তখন আমাদের জগতের

কথা ভাবত। তারা আমাদের কবরগুলোকে খুব ভালো অবস্থায় রাখত ; বেড়াগুলোকে নিখুঁতভাবে মেরামত করত, মাথায় ওপরকার বোর্ডটাকে রঙ করে বা চুনকাম করে রাখত, আর মরচে ধরতে বা নষ্ট হতে শুরু করলেই সেটা বদলে নতুন বোর্ড লাগিয়ে দিত; স্মৃতিফলকগুলোকে সোজা অবস্থায় রাখত, রেলিংগুলোকে ঝকঝকে করে রাখত, গোলাপের ঝাড় ও অন্যান্য ঝোপঝাড়কে কেটেছেটে সুন্দর করে দিত; আর রাস্তাগুলোকেও সব সময়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পাথর দিয়ে বেঁধে দিত। কিন্তু সেদিন আর নেই। বংশধররা আমাদের ভুলে গেছে। আমার এই বুড়ো হাতে উপার্জন করা টাকায় তৈরি মস্ত বড় বাড়িতে বাস করে আমার নাতি, আর আমি ঘুমোই এমন একটা অবহেলিত কবরে যেখানে আক্রমণকারী কীটরা আমার শবাবরণকে কেটে সেখানে বাসা তৈরি করে। আমি এবং আমার যে-বন্ধুরা এখানে শায়িত রয়েছে, তারাই এই সুন্দর শহরের পত্তন ও সমৃদ্ধি সাধন করেছি, আর আমাদের সেইসব বড়লোক সন্তানরা আজ আমাদের এমন একটা বিধ্বস্ত কবরখানায় ফেলে রেখেছে যাকে দেখে প্রতিবেশীরা অভিশাপ দেয় আর অপরিচিতরা নাক সিঁটকোয়। সেকাল আর একালের তফাৎটা দেখ—যেমন ধর : আমাদের সবগুলো কবরকে গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে; মাথার ওপরকার বোর্ডগুলো পুরনো হয়ে ভেঙে পড়েছে; রেলিংগুলো ক্লান্তিতে হেলে পড়েছে; কবরের পাথরগুলো নৈরাশ্যে মাথা নিচু করে আছে; কোনোরকম সাজসজ্জাই আর এখন নেই—গোলাপ নেই, ফুলের কেয়ারি নেই, পাথরে বাঁধানো পথ নেই; নয়নসুখকর কোনো কিছুই নেই; এমন কি, যে রঙহীন কাঠের বেড়াটা একদিন অন্য জন্তুজানোয়ারের সঙ্গ ও অসতর্ক পদক্ষেপের হাত থেকে আমাদের পবিত্রতাকে রক্ষা করত, সেটাও ভেঙে পড়ে রাস্তার ওপর ঝুলছে। আর তার ফলে আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর বিশ্রামস্থানের ওপর সকলের ঘৃণার দৃষ্টি আরও বেশি করে পড়েছে। তাছাড়া আমাদের এই দারিদ্র্য ও দুরবস্থাকে এখন আমরা অরণ্যের আড়ালেও ঢেকে রাখতে পারি না, কারণ শহর তার শীর্ণ হাত আমাদের বাসস্থানের দিকেও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এবার তাহলে বুঝতে পারছ—ব্যাপারটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বংশধররা যখন আমাদেরই টাকায় প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছে আমাদেরই চারপাশে, তখন মাথার খুলি ও হাড়কে একত্রে রাখতে আমাদের করতে হচ্ছে কঠোর সংগ্রাম। শুনলে অবাক হবে, আমাদের কবরখানায় এমন একটা কবরও নেই যেটা দিয়ে জল না পড়ে। রাতের বেলা বৃষ্টি হলেই আমাদের বেরিয়ে এসে গাছে উঠে বসে থাকতে হয়। কখনও কখনও গলার নিচে ঠাণ্ডা জলের ফোঁটা পড়ল। হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। যে-কোনো বৃষ্টি-ঝরা রাত বারটার পর যদি সেখানে যাও তাহলে দেখতে পাবে, আমাদের মধ্যে অন্তত পনের জন একহাতে গাছের ডাল ধরে ঝুলে আছে, হাড়ের জোড়াগুলো ভীষণভাবে শব্দ করছে, আর আমাদের পাঁজরের ভেতর দিয়ে বাতাস শোঁ-শোঁ করে বয়ে চলেছে। অনেক দিনই তিন-চার ঘণ্টা আমাদের এইভাবে কাটাতে হয়, তারপর ঠাণ্ডায় জমে কাঠ হয়ে নিচে নেমে এসে পরস্পরের মাথার খুলি ধার করে নিয়ে যার যার কবর খুঁড়ে বের করি। আমি মাথাটা পেছনে হেলিয়ে ধরছি, দেখ। খুলির মধ্যে কত পুরনো শুকনো মাটি জমে আছে। এর ফলে অনেক সময়ই মাথাটা ভারি লাগে। কোনো কোনো দিন ভোর হবার ঠিক আগে যদি তুমি সেখানে হাজির হও তাহলে দেখবে যে আমাদের শবাবরণগুলোকে বেড়ার ওপর শুকোবার জন্য মেলে দিয়েছি। আমরা কবরের মাটি খুঁড়ছি, আরে, একদিন আমার একটা চমৎকার শবাবরণ সেখান থেকে চুরিই হয়ে গেল। স্মিথ নামে এক মক্কেল সেটা নিয়ে গিয়েছিল। ওই দূরের একটা গরিব মানুষদের কবরখানায় সে থাকে। আমরা এ-কথা মনে করবার কারণ কি জান? যেদিন আমি

প্রথম তাকে দেখি সেদিন তার গায়ে একটা চৌখুপি শার্ট ছাড়া আর কিছুই ছিল না; কিন্তু নতুন কবরখানার একটা সামাজিক মিলন-অনুষ্ঠানে যখন কিছুদিন আগে তাকে দেখলাম তখন সে-ই ছিল সমবেত সকলের মধ্যে সবচাইতে সেরা পোশাকে সজ্জিত মৃতদেহ। আমাকে দেখেই সে সেখান থেকে প্রায় পালিয়েই চলে গেল; আবার সম্প্রতি এখানকার একটি বুড়ি তার শবাধারটিই খুইয়েছে—সাধারণত কোথাও গেলে সেটাকে সে সঙ্গে করেই নিয়ে যায়, কারণ তার শ্লেষ্মার ধাত, আর রাতের বাতাস বেশি গায়ে লাগলেই তার সেই বাতের ব্যথাটা চাড়া দিয়ে ওঠে। এর প্রকোপেই তার মৃত্যু ঘটেছিল। তার নাম হচ্‌কিস্-আন্না মাটিলডা হচ্‌কিস্—তুমি হয়ত তাকে চিনতেও পার। সামনের দুটো দাঁত এখনও আছে; বেশ লম্বা, কিন্তু এখন অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে সে, বাঁ-দিকে পাঁজরের একটা হাড় নেই; মাথায় বাঁ-দিক থেকে একগুছি বিবর্ণ চুল ঝুলে আছে, একগুছি আছে মাথার ঠিক ওপরে ডান কানের দিকটা ঘেঁষে; তার নিচের চোয়ালটা তার দিয়ে বাঁধা, আর বাঁ-হাতের একটা ছোট হাড় কখন লড়াই করতে করতে যে উড়ে গেছে সে নিজেও তা জানে না; হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি ভেঙে নাকের ছিদ্র দুটো আকাশের দিকে তুলে এক ধরনের ঝুঁকে ঝুঁকে সে হাঁটে—হয়ত কোথাও-না-কোথাও তাকে দেখেছ?'

'ঈশ্বর না করুন!' অনিচ্ছাকৃতভাবে কথাটা বলেই অপ্রস্তুত বোধ করলাম আমি তাড়াতাড়ি নিজের এই কঠোরতাকে শুধরে নিয়ে বললাম, 'মানে আমি শুধু বলতে চাই যে সে সৌভাগ্য আমার হয় নি; তুমি নিশ্চয়ই মানবে যে ইচ্ছে করে তোমার বন্ধুর সম্পর্কে কোনো রকম অসৌজন্যমূলক কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি বলেছিলে যে তোমার শবাবরণটি চুরি হয়ে গেছে, কিন্তু এখন যেটা তোমার গায়ে রয়েছে ছিন্ন দশা দেখেও তো মনে হয় যে একসময় এটা খুব দামিই ছিল। তাহলে—'

আমার অতিথির মুখমণ্ডলের শুকনো হাড় ও কুঁচকানো চামড়ার একটা ভৌতিক পরিবর্তন দেখা দিল; মুচকি হেসে বেশ চতুর ভঙ্গিতে সে জানাল যে, বর্তমান পোশাকটি যখন তার গায়ে উঠেছিল তার ঠিক আগেই পার্শ্ববর্তী কবরখানার জনৈক ভূতের একটি পোশাক খোয়া গিয়েছিল। ব্যাপারটা বোধগম্য হল। তবু তার মুখভঙ্গি—বিশেষ করে তার হাসি আমার ভালো লাগছিল না। তাই তাকে কথা চালিয়ে যেতে বললাম।

কঙ্কাল বলতে লাগল, 'হ্যাঁ বন্ধু, যা বললাম সেটাই প্রকৃত অবস্থা। দুটি পুরনো কবর—একটিতে আমি থাকতাম, আর একটি খানিকটা দূরে—আমাদের বর্তমান বংশধরদের দ্বারা এতদূর অবহেলিত হয়েছে যে, তাতে আর বাস করা যায় না। কঙ্কালের নিজস্ব অসুবিধা তো আছেই—আর এই বর্ষায় সেটা কম কথা নয় বর্তমান অবস্থায় সম্পত্তিরও বিস্তর ক্ষতি হচ্ছে। হয় আমাদের অন্যত্র চলে যেতে হবে, আর না হয় তো চোখের সামনে সবকিছু নষ্ট হয়ে যাওয়া দেখতে হবে। তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না, তবু একথা সত্য যে, আমার পরিচিত কারও শবাধারই এখন ভালো অবস্থায় নেই। পাইনকাঠের বাক্সে বোঝাই হয়ে ভাড়াটে গাড়িতে চড়ে যারা এখানে আসে সেই নিচু শ্রেণীর লোকেদের কথা আমি বলছি না; আমি বলছি তোমাদের সেই সব উঁচু মাপের রুপোর কারুকাজ-করা শবাধারের কথা, যেগুলো কালো পালক মাথায়-পরা মানুষদের শোভাযাত্রার আগে আসে, আর যারা ইচ্ছেমতো কবরের জায়গা বেছে নিতে পারে—অর্থাৎ জার্ভিস, ব্লেডসু ও বার্লিংদের কথাই আমি বলছি। সে-সবই আজ ধ্বংসের মুখে। তারাই ছিল আমাদের মধ্যে সবচাইতে শাঁসাল লোক। অথচ এখন তাদের দিকে তাকাও—একেবারেই রসহীন আর দারিদ্র্যপীড়িত। একজন ব্লেডসু তো জনৈক পরলোকগত নাপিতের কাছে দাড়ি কামাবার সরঞ্জামের বদলে তার

স্মৃতিফলকটাই বেচে দিল। অথচ একটি মৃতদেহের কাছে তার স্মৃতিফলকটিই হচ্ছে সব চাইতে গর্বের বস্তু। তার ওপর খোদাই করা কথাগুলো পড়তে সে ভালোবাসে। কোনোরকম অভিযোগ না করেই বলছি, আমার বংশধররা এই পুরনো পাথরটা ছাড়া আমার কবরে যে আর কিছুই দেয় নি তাতে প্রথমত আমার প্রতি খুবই খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে—তার ওপর আবার এই পাথরে কোনোরকম গুণকীর্তনই লেখা নেই। একসময় এই পাথরটার গায়ে লেখা ছিল—

'উপযুক্ত পুরস্কারই সে পেয়েছে'

লেখাটা দেখে প্রথমে খুবই গর্ববোধ হয়েছিল, কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই দেখতাম আমার কোনো পুরনো বন্ধু এখানে এলেই রেলিং-এর ভেতরে থুতনিটা গলিয়ে মুখ বাড়িয়ে এটা পড়ত আর তারপর মুচকি হেসে খুশি মনে ফিরে যেত। কাজেই ঐ বোকাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই লেখাটা আমি মুছে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু একটি মৃত মানুষের একমাত্র গর্বের জিনিস তার স্মৃতিফলকটাই। ঐ তো দূরে আধা ডজন জার্ভিস তাদের পারিবারিক স্মৃতিফলকটি সঙ্গে নিয়েই চলে যাচ্ছে। একটু আগে স্মিথরাও চলে গেল তাদের স্মৃতিফলক নিয়ে। আরে, হিগিন্স যে, বিদায় পুরনো বন্ধু! উনি হলেন মেরিডিথ হিগিন্স—৭৪ সালে মারা গিয়েছিলেন—কবরখানায় আমাদের দলেই ছিলেন—খুব পুরনো পরিবার—ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল—হয়ত আমার কথা শুনতে পায় নি বলে জবাব দিল না, তাই তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। ওকে দেখলে তোমারও ভালো লাগত। ও রকম বিকৃত, গাঁট-খোলা কঙ্কাল তুমি কখনও দেখ নি। সে যখন হাসে, মনে হয় দুটো পাথরে ঘষাঘষি হচ্ছে, কিন্তু লোকটি খুব আমুদে। সে এমনভাবে কথা বলে যেন কেউ জানালার কাচের ওপর নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। হেই জোন্স! উনি হলেন বুড়ো কলম্বাস জোন্স—তাঁর শবাচ্ছাদন তৈরি করতেই ব্যয় হয়েছিল চারশ ডলার—স্মৃতিফলকটার জন্য ব্যয় হয়েছিল সাতাশশ। '২৬ সালের বসন্তকালের কথা। তখনকার দিনের পক্ষে সে এক এলাহি ব্যাপার। সব জায়গা থেকে মৃতরা এসে ভিড় করেছিল তার তৈজস ইত্যাদি দেখতে। ঐ যে একটা কঙ্কাল একা একা চলেছে। বগলে এক টুকরো বোর্ড, হাঁটুর নিচেকার পায়ের একটা হাড় নেই, সঙ্গেও কিছু নেই—দেখতে পাচ্ছ? উনি হলেন বার্স্টো ডালহৌসি—যত লোক আমাদের কবরখানায় ঢুকেছে তাদের মধ্যে কলম্বাস জোন্সের পরে তিনিই ছিলেন সব চাইতে পরিপাটি-সাজে সজ্জিত। আমরা সবাই চলে যাচ্ছি। আমাদের বংশধরদের কাছে যে ব্যবহার পাচ্ছি তা আর আমরা সইতে পারছি না। তারা নতুন নতুন কবরখানা খুলছে, কিন্তু আমাদের ফেলে রেখেছে অনাদৃত অবস্থায়। কিছু রাস্তা তারা মেরামত করে, কিন্তু আমাদের রাস্তায় বা আমাদের জিনিসপত্রে কখনও হাত দেয় না। আমার শবাধারটিই দেখ—অথচ আমি বলছি একসময় এটা একটা দেখবার মতো আসবাব ছিল—শহরের যে-কোনো বসবার ঘরে রাখলে এটা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। যদি চাও তো এটা তোমাকে দিতে পারি—এটাকে মেরামত করার সামর্থ্য আমার নেই। তলাকার কাঠটা নতুন লাগিয়ে নিও, ওপরের কাঠটা কিছুটা পাল্টাতে হবে, বাঁ-দিকে একটা নতুন পটি বসিয়ে দিও, তাহলেই দেখতে একেবারে খাসা হবে। ধন্যবাদ দিতে হবে না—ওকথা বল না—তুমি আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেছ, তাই আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করবার আগেই আমার যা-কিছু আছে সব তোমাকে দিয়ে যাব। এই চাদরটা আমার বড়ই প্রিয়, তুমি যদি চাও—। চাও না? বেশ, তোমার যেমন মর্জি, আমি শুধু ন্যায়পরায়ণ ও উদার হতে চেয়েছিলাম—আমার মধ্যে নিচতা পাবে না। বিদায় বন্ধু, এবার আমাকে যেতে হবে। জানি না—হয়ত আজ রাতে আমাকে অনেকটা পথ চলতে হবে।

শুধু একটি কথা নিশ্চিত জানি, আমি এবার যাত্রীদলে ভিড়েছি, ঐ পুরনো কবরে আর আমাকে ঘুমুতে হবে না। একটা সম্মানজনক বাসস্থান না-পাওয়া পর্যন্ত আমি চলতেই থাকব, তাতে যদি নিউ জার্সি পর্যন্ত পা চালাতে হয় তাও সই। সকলেই চলেছে। গত রাতের জমায়েতেই স্থির হয়েছে চলে যেতে হবে; তাই সূর্য উঠবার সময় হলে দেখা যাবে পুরনো গোরস্থানে একটা হাড়ও পড়ে নেই। হ্যালো, ঐ যে জনাকয় ব্লেডসু যাচ্ছে; তুমি যদি পাথরটা তুলে নিতে একটু সাহায্য কর তাহলে আমিও ওদের দলে যোগ দিতে পারি। ওরা খুব বড় বংশের লোক। বিদায় বন্ধু!'

কবরের পাথরটাকে ঘাড়ে নিয়ে ভাঙা শবাধারটাকে টানতে টানতে সে শোভাযাত্রার সঙ্গে যোগ দিল; বেশ আন্তরিক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তার দানকে আমি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। যতদূর মনে হয় দু-ঘণ্টা ধরে বিষণ্ন সমাজ পরিত্যক্তের দল তাদের জিনিসপত্র নিয়ে সেখান দিয়ে যেতে লাগল, আর আমি বসে বসে করুণ চোখে তাদের দেখতে লাগলাম। তাদের মধ্যে যে দু-একজন অপেক্ষাকৃত যুবক, তাদের চেহারাও অতটা বিধ্বস্ত নয়। তারা রেলপথে মাঝরাতে চলাচলকারী ট্রেনের খোঁজখবর করল; মনে হল বাকিরা অনেক আগের লোক বলে রেলপথের কোনো খবরই রাখে না; তারা বিভিন্ন শহরে ও নগরে যাবার রাস্তাঘাটের যে-সব হদিস জানতে চাইল তাদের মধ্যে অনেক শহর-নগরের নাম এখন আর মানচিত্রেই পাওয়া যাবে না, দীর্ঘ ত্রিশবছর আগেই সেগুলো মানচিত্র থেকে এবং পৃথিবী থেকেও উধাও হয়ে গেছে। ঐ সব শহর-নগরের কবরখানার বর্তমান অবস্থা কেমন, আর মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সুনাম তাদের আছে কি না—সে-সম্পর্কেও তারা খোঁজখবর নিল।

সমস্ত ব্যাপারটাই আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করল; এই সব গৃহহারাদের জন্য আমার মনে সহানুভূতিও জাগল। যেন এ-সবই বাস্তব ঘটনা, যেন আমি মোটেই স্বপ্ন দেখছি না—এমনিভাবে জনৈক মৃত যাত্রীকে আমার মনোভাব জানিয়ে বললাম, এই বিচিত্র ও একান্ত দুঃখদায়ক অভিযানের একটা বিবরণ প্রকাশ করবার ইচ্ছে আমার মাথায় ঢুকেছে; আরও বললাম—যদিও এর যথাযথ বর্ণনা আমি করতে পারব না, তবু মৃতদের প্রতি যাতে এতটুকু অশ্রদ্ধা প্রকাশ না-পায় সে-বিষয়ে আমি সতর্ক থাকব। কিন্তু একজন প্রাক্তন নাগরিকের রাজকীয় ধ্বংসাবশেষ আমার ফটকের ওপর অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে কানে কানে বলল :

'ও নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। যে-কবরখানা ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি তাকে যারা এতদিন সহ্য করেছে, আজ সেই সব কবরখানায় যারা অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রইল তাদের সম্পর্কে যে যাই বলুক তাও তারা অবশ্য সহ্য করতে পারবে।'

ঠিক সে-মুহূর্তে একটা মোরগ ডেকে উঠল, আর সেই ভৌতিক শোভাযাত্রা অদৃশ্য হয়ে গেল, এক টুকরো ন্যাকড়া বা একখানি হাড়ও সেখানে পড়ে রইল না। আমার ঘুম ভেঙে গেল, দেখলাম, বিছানার বাইরে মাথাটা বেশ খানিকটা ঝুলিয়ে আমি শুয়ে আছি—এ অবস্থাটা হয়ত নীতিবাক্য সমন্বিত স্বপ্ন দেখার পক্ষে উপযুক্ত, কিন্তু কাব্যের পক্ষে অনুকূল নয়।

মন্তব্য : পাঠক নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আপনাদের কারো নিজের শহরের কবরখানার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা যদি ভালো থাকে, তাহলে ধরে নিতেই হবে এই স্বপ্ন আপনাদের শহরের বিরুদ্ধে মোটেই দেখা হয় নি; এ স্বপ্ন-বিবরণ বিশেষভাবে এবং একান্ত তিক্ততার সঙ্গে তার পার্শ্ববর্তী শহরের বিরুদ্ধেই লিপিবদ্ধ করা হল।

রচনাকাল : ১৮৭০

BanglaInternet.com

একটি উপকথা

কোনো একসময়ে একজন শিল্পী খুব সুন্দর ছোট একটি ছবি এঁকে সেটাকে এমনভাবে রাখল যাতে আয়নায় ছবিটির পুরো ছায়াটা দেখতে পাওয়া যায়। এতে দূরত্বটা দ্বিগুণ হওয়ায় ছবির রেখাগুলো নরম হয়ে ওঠে এবং ছবিটা আগের চাইতে দ্বিগুণ মনোরম দেখায়।

শিল্পীর বাড়ির পোষা বেড়ালটির মুখে এই কথা শুনল বনের সব পশুরা ; তারা ওই বেড়ালটিকে খুব প্রশংসার চোখে দেখত, কারণ বেড়ালটি ছিল শিক্ষিত, মার্জিত-রুচি ও সভ্য; সে এমন অনেক কিছু তাদের বলত যা তারা আগে জানত না বা জানলেও সে-সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না। এবার তারা বেড়ালের মুখে আয়নায় প্রতিফলিত ছবিটির ছায়া সম্পর্কে এই নতুন কথা শুনে খুব উৎসুক হয়ে উঠল। ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝবার জন্য এ-সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল। তারা যখন জিজ্ঞেস করল ছবিটা কী জিনিস, তখন বেড়াল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। সে বলল, 'এটা একটা সমতল জিনিস। খুব সুন্দরভাবে সমতল, আশ্চর্য রকমের সমতল, এর সমতলত্ব দেখে মুগ্ধ হতে হয়; আর কী সুন্দর!'

এ-কথা শুনে বনে পশুদের উত্তেজনা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তারা বলল, পৃথিবীর বিনিময়েও তারা ছবিটা দেখবে। তখন ভালুক জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কিসের জন্য ছবিটাকে এত সুন্দর মনে হয়?'

'ছবিটা দেখতেই সুন্দর বলে' বেড়াল বলল।

এই উত্তর শুনে পশুদের মনের আকর্ষণ ও অনিশ্চয়তা আরও বেড়ে গেল। তারা হয়ে পড়ল আগের চাইতেও বেশি উত্তেজিত। তখন গরু জিজ্ঞেস করল :

'আয়না কাকে বলে?'

বেড়াল বলল, 'আয়না হল দেয়ালের মধ্যে একটা গর্ত। তুমি যদি তার দিকে তাকাও তাহলেই ছবিটা দেখতে পাবে আর সে ছবি এত সুন্দর, এত সূক্ষ্ম, এত স্বর্গীয় যে, তার অকল্পনীয় সৌন্দর্য তোমাকে এতই অনুপ্রাণিত করবে, তোমার মাথা ঘুরতে থাকবে, আনন্দের আতিশয্যে তুমি মূর্ছিত হয়ে পড়বে।'

গাধা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি; এবার সে এ-ব্যাপারে একটু সন্দেহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। সে বলল, এত সুন্দর কোনো জিনিস এর আগেও ছিল না এবং আজও নেই। তার মতে যখন কোনো জিনিসের সৌন্দর্য সম্পর্কে বিরাট বিরাট বিশেষণ যোগ করে গলাবাজি করা হয় তখন সে-সৌন্দর্য সন্দেহের অবকাশ রাখে।

স্বাভাবিকভাবেই এই সন্দেহ পশুদের মধ্যে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। আর তাতে বেড়ালটি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। দিন দুয়েকের মধ্যে এ-ব্যাপারে আর কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করল না; কিন্তু পরে আবার নতুন করে উৎসাহ দেখা দিল এবং সকলের আগ্রহ স্পষ্ট চোখে পড়ল। তারা তখন গাধাটাকে খুব বকাবকি করল, কারণ সে বিনা-প্রমাণেই ছবিটা সুন্দর নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করায় তাদের এত বড় একটা সম্ভাবিত আনন্দকে নষ্ট করে দিয়েছে।

এত বকুনি খেয়েও গাধা কিন্তু বিচলিত হল না। সে খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে বলল, তার

আর বেড়ালের মধ্যে কে ঠিক বলেছে সেটা স্থির করবার একটাই উপায় আছে : সে নিজেই সেখানে গিয়ে গর্তটা দেখে এসে বলবে সে কী দেখল! পশুরা এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আর খুশি হয়ে গাধাকে সেখানে যেতে বলল—গাধাও তাদের কথামতো কাজ করল :

কিন্তু সে জানত না ঠিক কোথায় দাঁড়াতে হবে, সে জন্য সে ভুল আয়না আর ছবিটার মাঝখানে দাঁড়াল। তাতে ফল হল—আয়নায় ছবিটাকে দেখাই গেল না। গাধাটা ফিরে এসে বলল :

'বেড়াল মিথ্যে কথা বলেছে। ওই গর্তে একটা গাধা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। যদিও সেটা খুব সুন্দর আর ভালো একটা গাধা, তবু সেটা শুধু একটা গাধা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

হাতি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কাছের থেকে খুব পরিষ্কারভাবে দেখেছিলে তো?'

'ওহে পশুরাজ হাতি, আমি খুব কাছ থেকে পরিষ্কার দেখেছি। আমি এত কাছে থেকে দেখেছি যে, আমার নাক আয়নাটাতে লেগে গিয়েছিল।'

হাতি বলল, এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার! যতদূর জানি বেড়ালটা তো সব সময়ই আমাদের কাছে সত্যি কথাই বলে। তার চেয়ে বরং আর একজন সাক্ষী পাঠিয়ে দেখা যাক। ভালুক, তুমি বরং যাও, গর্তটা দেখ, তারপর ফিরে এসে বল কী দেখলে।'

ভালুক তখন সেখানে গেল। ফিরে এসে বলল : বেড়াল আর গাধা দু-জনেই মিথ্যে কথা বলেছে। গর্তে একটা ভালুক ছাড়া আর কিছুই নেই।'

পশুরা তো এবার অবাক হয়ে মহাধাঁধায় পড়ে গেল। প্রত্যেকেই তখন নিজে গিয়ে দেখতে চাইল আসলে ব্যাপারটা কী! হাতিও তাদের এক-এক করে পাঠাতে লাগল।

প্রথমে গেল গরু । গর্তে একটি গরু ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না। বাঘ একটা বাঘ ছাড়া আর কিছুই দেখল না। সিংহ, সিংহ ছাড়া আর কিছু দেখল না।

চিতা দেখল শুধুই একটা চিতাবাঘ। উটও দেখল একটা উট, আর কিছু নয়।

হাতি তখন ভীষণ রেগে গিয়ে ঠিক করল, সে নিজই গিয়ে আসল সত্যিটা জেনে আসবে। ফিয়ে এসে সে সমস্ত প্রজাদের মিথ্যে কথা বলবার জন্য খুব বকুনি দিল এবং বেড়ালের নৈতিক ও মানসিক অন্ধত্বের জন্য এমন রেগে গেল যে, তাকে আর শান্ত করা গেল না। সে বলল, একটা আধ-কানা মুর্খ ছাড়া আর সকলেই ওই গর্তে একটা হাতি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না।

বেড়ালের শিক্ষা

তুমি যদি তোমার কল্পনার আয়না এবং বাস্তবের মধ্যে দাঁড়াও তাহলে তুমি যা কিছু সঙ্গে নেবে তা-ই সেখানে দেখতে পাবে। তোমার কান-দুটো যদি সেখানে নাও দেখতে পাও, তবু জানবে কান-দুটো সেখানেই আছে।

রচনাকাল : ১৯০৯

Banglainternet.com

নরখাদক

ইন্ডিয়ানার টেরি হটেতে ট্রেন বদল করে পশ্চিমমুখী এগুচ্ছি, যাব সেন্ট লুই। পথের পাশের কোনো স্টেশন থেকে এক ভদ্রলোক উঠে এসে আমার পাশে বসলেন, সারা মুখে দয়ালু-ভাব। বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশেক, হয়ত পঞ্চাশও হতে পারে। ঘণ্টাখানেক নানা বিষয়ে আলোচনা করে বুঝলাম, ভদ্রলোক সদালাপী আর বেশ বুদ্ধিমান। আমি ওয়াশিংটনে থাকি জানতে পেরে তক্ষুনি একাধিক সেনানায়ক আর কংগ্রেসের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। বুঝতে দেরি হল না যে, এমন একজনের সাথে কথা বলছি—রাজনৈতিক জীবনের নাড়ি-নক্ষত্র, এমন কি জাতীয় আইনসভার রীতি-নীতি সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল।

দু-জন লোক এগিয়ে যাচ্ছিল আমাদের পাশ দিয়ে। মুহূর্তখানেক থামল তারা। একজন তার সাথিকে বলল, 'হ্যারিস, ও-কাজটা করে দিলে সারা জীবন তোমার কথা মনে থাকবে।'

আমার নতুন চেনা বন্ধুর চোখ আনন্দে নেচে উঠল। মনে হল, কোনো সুখকর স্মৃতির প্রতিফলন পড়েছে তাঁর মনের পর্দায়। তারপরই মিলিয়ে গেল সে ভাব। বলতে গেলে বিষাদের ছায়াই নেমে এল তাঁর মুখে। আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনাকে একটা গল্প শোনাচ্ছি। এটা আমার জীবনের এক গোপন অধ্যায়—আর কাউকেই কোনোদিন বলা হয় নি। এ-গল্প ধৈর্য ধরে শুনুন, তবে তার আগে কথা দিন যে, আমাকে বাধা দেবেন না।'

সে প্রতিশ্রুতি আমি দিলাম। তারপর তিনি বললেন নিচের গল্পটি—গলার স্বরে কখনো হিংস্রতা, কখনো বিষাদক্লিষ্টতা, তবু অনুভূতি আর আন্তরিকতায় গাঢ় সেই স্বর।

তারিখটা ১৮৫৩ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর। সন্ধের গাড়িতে সেন্ট লুই থেকে শিকাগো রওয়ানা দিয়েছি। গাড়িতে সব মিলিয়ে চব্বিশ জন যাত্রী আমরা, নারী বা শিশু নেই একজনও। খোশমেজাজে চলেছি সকলে, কাজেই আলাপ-পরিচয় আর খোশগল্প শুরু হতেও দেরি হল না। সব মিলিয়ে শুভযাত্রারই লক্ষণ। ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবতে পারেন নি যে, কী বিপদ ওত পেতে আছে সামনে।

রাত এগারোটার দিকে প্রচণ্ড তুষারপাত শুরু হল। ছোট গ্রাম ওয়েল্ডন ছাড়িয়ে যাবার একটু পরেই আমরা পড়লাম এই ভয়াবহ প্রেইরিতে। জুবিলি উপনিবেশ পর্যন্ত মাইলের পর মাইল বিস্তৃত এই রিক্ত প্রান্তরে জনমানব বা ঘরবাড়ির চিহ্নটি নেই। বুঝে দেখুন, পাহাড়টিলা, গাছপালা, এমনকি ছুটকো-ছাটকা পাথরের বাধাও না থাকায় কী সাংঘাতিক জোরে বাতাস বইছিল আর তুষারকে ঠেঙিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। ক্রমেই গাঢ় হয়ে জমেছে বরফ। ক্রমেই শ্লথ হয়ে আসা ট্রেনের গতি থেকে বুঝতে পারছি, খুব কষ্ট করে পথ করে নিতে হচ্ছে ইঞ্জিনকে। মাঝে মাঝে একেকবার প্রায় থেমে যাচ্ছে ট্রেন। যাত্রীদের কলগুঞ্জন স্তিমিত হয়ে এসেছে। একটু আগের খোশমেজাজের বদলে সকলেরই মন ভারি হয়ে এসেছে উদ্বেগে। চারপাশে পঞ্চাশ মাইলের ভেতর জনমানবহীন এই ঊষর প্রান্তরে বরফে আটকা পড়ে যাবার আশঙ্কায় সকলেই চিন্তাকুল। এই অস্বস্তির ভেতরেও তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। রাত-দুটোয় ঘুম ভেঙে যেতেই ঘুম ভাঙার কারণটা টের পেলাম। আশপাশের সব গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভয়াবহ সত্যটা মুহূর্তের ভেতরই মনের ভেতরটায় কাঁপন দিয়ে গেল।

জমাট বরফে আটকা পড়ে গেছি আমরা। 'সবাই হাত লাগান, পথ পরিষ্কার করতে হবে—সবাই!' চড়া গলায় কার যেন আদেশ ভেসে এল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সকলে মিশকালো আঁধারে মুষল তুষারপাতের সেই উদ্দাম রাতে লাফিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। শাবল, কাঠের টুকরো এমন কি খালি হাতে পর্যন্ত লেগে গেল সবাই বরফ সরাতে। সে-দৃশ্য বর্ণনার বাইরে। ছোট একদল মানুষ কেউ জমাট আঁধারে, কেউ-বা ইঞ্জিনের অস্পষ্ট আলোয় মরিয়া হয়ে লড়ছে তাল তাল জমা বরফের বিরুদ্ধে। সকলের মনেই ঘুরছে একই কথা—মুহূর্তের বিলম্বের জন্যও আটকা পড়ে যেতে হতে পারে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত।

কিন্তু মাত্র ঘণ্টাখানেকের ভেতরই আমাদের চেষ্টার অসারতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল। আমরা একতাল বরফ সরাচ্ছি, ততক্ষণে জমে গেছে আরো বার তাল বিপদের ওপর বিপদ। দেখা গেল, বরফের সাথে শেষ ধাক্কায় ইঞ্জিনের চাকার দুটো শ্যাফট ভেঙে গেছে। অবস্থা এমন যে পথ খোলা পেলেও সমান অসহায় হয়েই থাকতে হবে আমাদের। শ্রান্ত দেহে বিষণ্ন মনে গাড়িতে উঠে এলাম! অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে জড় হয়ে নিজেদের অবস্থার পর্যালোচনায় বসলাম। কারো সাথেই খাবার জিনিস নেই কিছু—সবচাইতে বিপদের কারণ এটা। অবশ্যি শীতে জমে যাবার ভয় নেই। যথেষ্ট জ্বালানি-কাঠ আছে গাড়িতে। কিন্তু এ আর কতটুকু সান্ত্বনা! শেষ পর্যন্ত কন্ডাক্টরের উপদেশ মানাই সাব্যস্ত হল। এই গাঢ় বরফে পঞ্চাশ মাইল পায়ে হেঁটে যাবার চেষ্টা করার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। সাহায্যের জন্যে খবর পাঠানোও সম্ভব নয়, সম্ভব হলেও সাহায্য আসবে না। কাজেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের মুক্তির বা অনাহারে মৃত্যুর জন্যে। আসামি যেমন করে মৃত্যু-দাণ্ডাজ্ঞা শোনে, তেমনি আমাদের ভেতরে সবচাইতে সাহসী যারা তাদেরও বুক কেঁপে উঠেছিল সেদিন।

আলাপ-আলোচনা স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাতাসের ঝাপটার ফাঁকে ফাঁকে শুধু আভাস পাওয়া যায় মৃদু গুঞ্জনের। বাতির আলো অস্পষ্টতর হয়ে এসেছে। ভাগ্যাহত যাত্রীদের বেশির ভাগই শুয়ে পড়েছে এখানে-ওখানে, আলো-আঁধারির মাঝে। শুয়ে চিন্তা করছে, চেষ্টা করছে বর্তমানকে ভুলে থকতে—সম্ভব হলে ঘুমুতেও।

অনন্ত রাত—অন্তত আমাদের অনন্তই মনে হয়েছিল—পঙ্গু প্রহরগুলোকে নিয়ে গড়িয়ে চলে। একসময় পূর্বাকাশে হিমাতুর, ধূসর প্রভাতের উদয় হল। আলোর রেশ আরেকটু জোরালো হতেই একে-একে যাত্রীদের ভেতর জীবনস্পন্দন দেখা দিল। জমে-আসা হাতপা ছড়িয়ে দিল তারা। তারপর জানলা-পথে মুখ বাড়িয়ে দেখল নিরানন্দ বাহিরকে। আসলে নিরানন্দই সে দৃশ্য। একটি প্রাণীর সাড়া নেই কোনো দিকে, নেই কোনো ঘরবাড়ির চিহ্ন। পুরু সাদা বরফে চাদরে মোড়া সীমাহীন সে মরুভূমি। বাতাসের চাবুক-খাওয়া চাপাড়াগুলো উঠে আসছে—ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে এদিক-সেদিক। ফেনার মতো তুষারের ছোটাছুটিতে দেখা যায় না ওপরের নীলাকাশও।

সারাটা দিন ধরে এগাড়ি-ওগাড়ি ঘুরে বেড়ালাম আমরা। কথা বলছি খুবই কম, তবু অনন্ত চিন্তার স্রোত বয়ে যাচ্ছে সকলের মনেই। তারপর আরেকটি প্রায় অনন্ত অস্বস্তিকর রাত—আর তীব্র ক্ষুধার দাহন। পরের দিন আবার সকাল হল। আরেকটি দিন কেটে গেল বাকরোধ করা বিষাদে, ক্ষুধার প্রদাহে আর অসম্ভব সাহায্যের ব্যর্থ প্রতীক্ষায়। অস্বস্তিকর তন্দ্রার রাত—মহাভোজের স্বপ্ন দেখছি, তারপর আবার জেগে উঠছি অসার করে দেওয়া ক্ষুধার ভেতরে।

চারটি দিন গেল আর এল—তারপর এল পঞ্চম দিন! পাঁচদিনের অনাহার আর বন্দিদশা! হিংস্র বুভুক্ষা তার হিংস্রতার ছাপ ফেলেছে প্রতিটি চোখে। প্রতিটি বুকে ঘোরাফেরা

করছে এমন কিছু, যার ছায়া পড়েছে প্রতিটি বুকেও—তবুও সেটা এমন কিছু যা উচ্চারণ করার সাহস তখনও হচ্ছে না কারোই।

ষষ্ঠ দিনও যায়। সপ্তম দিনের ভোর হল মৃত্যু-গুহায় কয়েকটি নুয়ে-পড়া দেহ আর বিবশ-মনের মানুষের ওপর। এই বুঝি বেরিয়ে পড়ে! যা এ কয়দিন সকলের মনেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল—এবারে তা প্রকাশের বাসনায় ভর করেছে রসনাগ্রে। অনেক মাশুল বসানো হয়েছে প্রকৃতির ওপর, এবারে হাল তাকে ছাড়তেই হবে। লম্বা গড়নের অগোছাল আর বিবর্ণ লোকটা মিনেসোটার রিচার্ড এইচ গ্যাস্টন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ততক্ষণে সকলের মনেই জানা হয়ে গেছে কী আসছে সামনে। তার জন্যে তৈরিও সকলে—হৃদয়াবেগ, চিত্তচাঞ্চল্যের শেষ রেশটুকু পর্যন্ত স্থির হয়ে গেছে। গত ক-দিন ধরে যে চোখগুলোতে ছিল হিংস্র লোলুপতা, এখন সেখানে এসেছে চিন্তার গভীরতা।

'ভদ্র মহোদয়গণ, আর দেরি করা চলে না। সময় খুবই সংকীর্ণ। আমাদের স্থির করতে হবে—অন্যদের খাবার জোগাতে কাকে কাকে প্রাণ দিতে হবে!'

ইলিওনিসের মি. জন জে উইলিয়ামস উঠে দাঁড়ালেন : 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি টেনেসির রেভারেন্ড জেমস সয়্যার—এর নাম প্রস্তাব করছি।'

ইন্ডিয়ানার মি. উইলিয়াম আর এডাম্‌স্ বললেন : 'আমি প্রস্তাব করছি, নিউইয়র্কের মি. ড্যালিয়েল স্টোলের নাম।'

মি. চার্লস জে ল্যাংডন : 'আমি সেন্ট লুই'র মি. স্যামুয়েল এ বাওয়েনকে মনোনীত করছি।'

মি. স্টোল : 'আমি নিউজার্সির মি. জন এ. ভ্যান নস্ট্রান্ডের সপক্ষে সরে দাঁড়াচ্ছি।'

মি. গ্যাস্টন : 'কারো আপত্তি না থাকলে এ ভদ্রলোকের ইচ্ছেই পূর্ণ হবে।'

মি. ভ্যান নস্ট্রান্ড আপত্তি করায় মি. স্টোলের পদত্যাগ নাকচ হয়ে গেল। মেসার্স সয়্যার এবং বাওয়েনও পদত্যাগের প্রস্তাব করেন। তবু একই কারণে তাঁদের প্রস্তাবও বাতিল হয়ে গেল।

ওহায়োর মি. এ এল ব্যাসকম : 'আমি প্রস্তাব করছি যে, মনোনয়ন এখানেই শেষ করা হোক—তারপর শুরু হোক ব্যালট ভোট।'

মি. সয়্যার : 'ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, এসব কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আমি আন্তরিক প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এগুলো সবদিক থেকেই রীতি-বিরুদ্ধ এবং অশোভন। এসব কার্যবিবরণী অবিলম্বে পরিত্যাগের প্রস্তাব করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। আমাদের উচিত একজন চেয়ারম্যান আর তাঁকে সাহায্য করার জন্য যথোপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা। কেবল তা হলেই আমরা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং পারস্পরিক সমঝোতার ভেতর দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারব।'

আয়োরার মি. বেল : 'ভদ্র মহোদয়বৃন্দ—আমি আপত্তি করছি। এটা রীতি-নীতির কচকচি আর আড়ম্বরানুষ্ঠানের সময় নয়। সাতদিন ধরে পেটে দানাটি পড়ে নি কারো, বাজে আলোচনায় সময় নষ্ট করে নিজেদের আরো কাহিল করে ফেলছি আমরা। এ-পর্যন্ত যেসব প্রস্তাব করা হয়েছে, তাতে আমার পুরোপুরি সায় আছে—আমার বিশ্বাস, সমবেত ভদ্র মহোদয়বৃন্দ, বিশেষ করে আমি নিজে তো বটেই, মনে করি যে, প্রস্তাবিতদের ভেতর আমাদের অবিলম্বে এক বা একাধিক জনকে বেছে নেওয়া উচিত। আমি প্রস্তাব করতে চাই যে—'

মি. গ্যাস্টন : 'এতেও আপত্তি উঠবে। নিয়ম-মাফিক এ-প্রস্তাব সম্পর্কে পুরো একদিন

ভেবে দেখা দরকার। এতে করে বরং যে দেরি আপনি এড়াতে চেয়েছেন, সেটাই অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। নিউজার্সির ভদ্রলোক—'

মিঃ ভ্যান নস্ট্র্যান্ড : 'ভদ্র মহোদয়গণ, আমি আপনাদের অপরিচিত। যে সম্মান আপনারা আমাকে দিলেন, সেটার অনুপযুক্ত আমি। বিশেষ করে আমি একটা সঙ্কোচ—'

আলাবামার মিঃ মর্গ্যান (বাধা দিয়ে) : 'আমিও পূর্ববর্তী প্রস্তাবটি পেশ করছি।'

এ প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ায় বাক-বিতণ্ডা থেমে গেল। এবার শুরু হল কর্মকর্তা নির্বাচন। মি. গ্যাস্টন হলেন চেয়ারম্যান মি. ব্লেক সেক্রেটারি; মেসার্স হলকুম্ব, ডায়ার ও বলডুইনকে নিয়ে একটা কমিটি গঠিত হল। কমিটি আবার তাঁদের বাছাইয়ের কাজে সাহায্য করবার জন্যে মি. আর এম হাউল্যান্ডকে মনোনীত করলেন।

এবারে আধ-ঘন্টার বিরতি। কিছুক্ষণ ফিস্‌ফাস। ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে আবার শুরু হল সভার কাজ। প্রার্থীরূপে কেন্টাকির মিঃ ফার্গুসেন, লুইসিয়ানার সুসিয়েন হারম্যান ও কলারাডোর ডব্লুমেসিকের নাম ঘোষণা করে কমিটি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেন। বিবেচনার জন্যে গৃহীত হল এ-রিপোর্ট।

এবার উঠে দাঁড়ালেন মিসৌরির মিঃ রোজার্স। বললেন : 'মাননীয় সভাপতি, রিপোর্টটি এখন যথারীতি পরিষদের বিবেচ্য বলে, আমি একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনতে চাই। আমি প্রস্তাব করছি, মি. হারম্যানের স্থলে সেন্ট লুইর মি. সুসিয়ান হ্যারিসের নাম বসানো হোক। এ ভদ্রলোক সুস্থ সমর্থ—আর আমরা সকলেই তাঁকে সম্মানিত ব্যক্তি বলে মনে করি। কিন্তু তাই বলে কেউ যেন মনে করেন না যে, লুইসিয়ানার ভদ্রলোকের সম্মানিত চরিত্র সম্পর্কে কোনোরকম অশ্রদ্ধাজনক মন্তব্য করতে চাইছি আমি; সেটা আদৌ আমার উদ্দেশ্য নয়।

এখানে উপস্থিত আর কারো চাইতে তাঁকে আমি কম শ্রদ্ধা-ভক্তি করি নে। কিন্তু একথা তো আমরা লক্ষ না-করে পারি না যে, গত একসপ্তাহে আমাদের অন্য যে কারো চাইতেও তাঁর গায়ের গোশতই অনেক বেশি কমেছে। আমরা তো অন্ধ নই যে, কমিটির কাজের গাফলতি ধরতে পারব না। ভদ্রলোকের ইচ্ছে যত পবিত্রই হোক না কেন, কম পুষ্টির একজন লোককে আমাদের কল্যাণে নিয়োগ করে কমিটি হয় কর্তব্যে উপেক্ষা, না-হয় বৃহত্তর কোনো অন্যায়—'

সভাপতি : 'মিসৌরির ভদ্রলোক কি দয়া করে বসবেন? নিয়মমাফিক কোনো পদ্ধতি ছাড়া কমিটির কর্তব্যনিষ্ঠায় সন্দেহ প্রকাশ করতে দেওয়া চলতে পারে না। পরিষদ ভদ্রলোকের প্রস্তাব সম্পর্কে কী ব্যবস্থা করতে চান?'

ভার্জিনিয়ার মি. হ্যালিডে : 'এই সঙ্গে আমি আরো প্রস্তাব করছি যে, মি. মেসিকের স্থলে ওরিগনের মি. হার্ভি ডেভিসের নাম বসানো হোক। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ বলতে পারেন যে, সীমান্ত অঞ্চলের কঠোর জীবন যাপন করে মিঃ ডেভিসের মাংসপিণ্ডগুলো শক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, এটা কি শক্ত নরম নিয়ে বাক-বিতণ্ডার সময়? এখন কি খুঁতখুঁত করার সময়? ছোটখাট ব্যাপারে মাথা ঘামানো কি এখন সাজে। না, ভদ্রমহোদয়গণ মেধা নয়, প্রতিভা নয়, এমন কি শিক্ষাও নয়—পুষ্টি, ওজন ও আকারই হচ্ছে আজকের সবচাইতে বড় মাপকাঠি। আমি দাবি করছি, আমার প্রস্তাব বিবেচনা করা হোক।'

মি. মর্গ্যান (উত্তেজিত স্বরে) : 'মাননীয় সভাপতি, আমি প্রবলভাবে এ-সংশোধনীর বিরোধিতা করছি। ওরিগনের ভদ্রলোক বৃদ্ধ, তাছাড়া হাড়গুলোই তাঁর মোটা, মাংস বেশি নয়। ভার্জিনিয়ার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি, সুরুয়াই আমাদের দরকার, না চিবোবার মতো কিছু? ছায়া দেখিয়ে আমাদের ভোলাতে চান তিনি। এত দুঃখ-কষ্টের ভেতরে ওরিগনের

BanglaInternet.com

হাড্ডি নিয়ে পরিহাস করতে চান তিনি? জিজ্ঞেস করি, চারপাশের উদ্বিগ্ন চোখ, বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আর আশায় উত্তেজিত বুকের কথা মনে করেও এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত ঠগকে আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিতে চান তিনি? জানতে চাই, আমাদের দুর্ভাগ্য, অতীতের দুঃখ আর অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা মনে করেও ওরিগনের এই হাড্ডিসার, উজবুক আর হা-ঘরেকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান তিনি? না, কখখনো না।' (হাততালি)

প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং উত্তেজিত বিতর্কের পর প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রথম সংশোধনী গ্রহণ করে মি. হ্যারিসের নাম বসানো হল। এবারে শুরু হল ব্যালট-ভোট। প্রথম পাঁচটি ব্যালটে কোনো সিদ্ধান্ত হয় না। ষষ্ঠ ব্যালটে মি. হ্যারিস নির্বাচিত হলেন। তিনি নিজে ছাড়া আর সকলেই তাঁর পক্ষে ভোট দেন। কে যেন প্রস্তাব করলেন যে, সকলে উল্লাসধ্বনি সহকারে নির্বাচনকে সমর্থন জানাবেন। এতেও কাজ হল না—মি. হ্যারিস নীরবই রইলেন।

এরপর মি. র‍্যাডওয়ে প্রস্তাব করলেন, 'পরিষদ এবারে বাকি প্রার্থীদের বিষয় বিবেচনা এবং প্রাতরাশের জন্যে কাউকে নির্বাচিত করুন।' প্রস্তাবটা সঙ্গে সঙ্গেই বিবেচনার জন্যে গৃহীত হয়।

প্রথম ব্যালটে ভোটসংখ্যা সমান দাঁড়ায়। একদল একজন যুবককে নির্বাচিত করেন তার বয়েসের কথা চিন্তা করে, অপরদল বপুর দিকে লক্ষ রেখে অন্য এক ব্যক্তির সপক্ষে মত দেন। সভাপতি শেষোক্ত প্রার্থী মি. মেসিকের পক্ষে তাঁর ভোট দিলেন। এ-সিদ্ধান্তে পরাজিত প্রার্থী মি. ফার্গুসনের বন্ধুদের ভেতর অসন্তুষ্টি দেখা দেয়। এমন কি কেউ কেউ আবার নতুন ব্যালটের কথা আলোচনাও শুরু করে দেন। এরই ভেতর একটা মুলতবি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সভা ভেঙে যায়।

রাতের খাবারের প্রস্তুতির দরুণ সকলেরই মনোযোগ বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হওয়ার ফার্গুসন সমর্থক দল তাঁদের অভিযোগ নিয়ে খুব বেশি আলোচনার সুযোগ পেলেন না। সুযোগ যখন পেলেন সৌভাগ্যবশত ঠিক তখুনি জানা গেল যে, মি. হ্যারিস তৈরি হয়ে গেছেন।

গাড়ির আসনগুলো উল্টে মোটামুটি টেবিলের কাজ চালাবার ব্যবস্থা করা হল আর তার চারপাশ ঘিরে বসলাম আমরা—সাতদিন পর প্রথম খাবারের আশায় উৎফুল্ল কজন মানুষ। মাত্র ক-টি ঘণ্টার ব্যবধান কী পরিবর্তনই না আনতে পারে। একটু আগেও হতাশা বিষাদ, ক্ষুধা আর উদ্বেগ মূর্ত হয়েছিল সবারই চোখে-মুখে। আর এখন? সবার মুখেই এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও উল্লাসের অভিব্যক্তি। ঘটনাবহুল আমার জীবনেও এর চাইতে সুখকর মুহূর্ত আর আসে নি। আমাদের কয়েদখানার ওপরে আর চারপাশে তখনও ক্ষ্যাপা হাওয়া গর্জাচ্ছে, ঝেটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পেঁজা-তুলোর মতো বরফকে। কিন্তু তারা এখন শক্তিহীন। একটি প্রাণীও আর উদ্বিগ্ন নয় তাতে। হ্যারিসকে খুবই ভালো লেগেছিল আমার। রান্নাটা হয়ত আরেকটু ভালো করা যেত। তবু আজ অসঙ্কোচে বলতে পারি যে, আর কোনো মানুষই হ্যারিসের মতো আনন্দ দেয় নি আমাকে। অবশ্যি, মেসিকও ভালো ছিল, বিশেষ করে তার সুঘ্রাণটা মনে রাখবার মতো। কিন্তু পুষ্টি আর নরম আঁশের দিক থেকে হ্যারিসের সাথে তার তুলনা হয় না। নিন্দে না করেও বলতে হয়, প্রাতরাশের জন্যে মরা মানুষের চাইতে মেসিক খুব বেশি ভালো ছিল না—রোগা-পাতলা, হাড্ডিসার। এমনটা যে, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।'

'তাহলে আপনারা সত্যি সত্যি—'

'দয়া করে বাধা দেবেন না। প্রাতরাশের পর রাতের খাবারের জন্যে আমরা ওয়াকার নামে ডেট্রয়েটের একজনকে নির্বাচিত করলাম। লোকটা খুব ভালো ছিল। পরে ওর স্ত্রীকেও

সে-কথা লিখে জানিয়েছিলাম আমি। সত্যি প্রশংসা পাবার যোগ্য এই ওয়াকার। ওকে আমার মনে পড়বে। ছোটখাট হলেও ভালো ছিল লোকটা। পরদিন সকালে প্রাতরাশ হল আলাবামারার মর্গ্যানকে দিয়ে। অমন খাসা লোকের স্বাদ পাই নি আর কখনো—সুন্দর, শিক্ষিত, মার্জিত। অনেকগুলো ভাষা জানত আর চমৎকার ভদ্রলোক। তাছাড়া, বেশ রসালও ছিল লোকটা। রাতে ছিল ওরিগনের পাদ্রিটার পালা। পয়লা নম্বরের জোচ্চোর ছিল লোকটা—বুড়ো আর শক্ত। বিরক্ত হয়ে বললাম : ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের যার যা খুশি করতে পারেন। নতুন করে নির্বাচন না-হলে আমি কিন্তু আর হাত তুলছি না।' ইলিওনিসের গ্রাহামস্‌ও বলল : 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমারও সে-কথা। যদি দেখি সবদিক বিচার-বিবেচনা করে নির্বাচন করছেন আপনারা, তাহলে আবার সানন্দে আপনাদের দলে যোগ দেব।' শিগগিরই দেখা গেল যে, ওরিগনের ডেভিসকে নিয়ে কম-বেশি সকলেই অখুশি হয়েছে। কাজেই হ্যারিসের সময় থেকে যে সদিচ্ছা বজায় ছিল সেটা টিকিয়ে রাখার জন্যে নতুন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। আর এর ফলে জর্জিয়ার বেকারকে পছন্দ করা হয়। সে ছিল খাসা! হ্যাঁ, এরপর পালা ছিল একে একে ডুলাইট, হবিন্স, ম্যাকলেরয় (লোকটা খুব বেঁটে আর পাতলা বলে কেউ কেউ অখুশি হয়েছিল); তারপর পেনরড ডুজন স্মিথ, বেইলি (একটা পা এর কাঠের ছিল বলে মাংস কম ছিল; তাছাড়া ভালোই ছিল সে); তারপর একটি ইন্ডিয়ান ছেলে, অর্গ্যান মিস্থ একজন আর বাক্‌মিনাস্টার বলে এক ভদ্রলোক। শেষের লোকটা এক হাড্ডিসার হা-ঘরে সঙ্গী হিসেবে যেমন অপাংক্তেয়, খাবার টেবিলেও লোকটা ছিল ষাঁড়ের গোবর। কপাল ভালো যে, উদ্ধারকারী ট্রেন এসে পড়বার আগেই ওকে বেছে নিয়েছিলাম আমরা।'

'তা হলে উদ্ধারকারী ট্রেন একটা এসেছিল শেষ পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, এসেছিল। ফুটফুটে রোদওয়ালা এক সকালে যখন আমরা সবে নির্বাচন শেষ করেছি, তখনই এসে পড়ে ট্রেনটা। সেদিন ঠিক হয়েছিল জন মারফির পালা। হলফ্ করে বলতে পারি, তখন আর তার চাইতে ভালো প্রার্থী ছিল না কেউ। অবশ্যি, উদ্ধারকারী ট্রেনে আমাদের সাথেই সে ফিরে আসে আর হ্যারিসের বিধবাকে বিয়ে করে—'

'হ্যারিসের—'

'হ্যাঁ, হ্যারিসের বউকে। সে তাকে বিয়ে করে। বেঁচে আছে বেশ সুখে-সম্পদে। উপন্যাসের মতো, মশাই—একেবারে প্রথম প্রেমের মতো। আমার নামবার জায়গাও এসে গেল। আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে এবারে। সময় করে যদি দু-একদিনের জন্যেও বেড়াতে আসেন, খুবই খুশি হব। সত্যি বলতে কী, খুবই পছন্দ হয়েছে আপনাকে। প্রায় হ্যারিসের মতোই স্নেহ গজিয়ে গেছে আপনার ওপর। বিদায়! আপনার যাত্রা শুভ হোক।'

নেমে গেল। এর আগে কখনো এত বিপন্ন, অবসন্ন আর হতভম্ব বোধ করি নি। লোকটা চলে যাওয়ায় অন্তর থেকে খুশি হলাম। ভদ্রতা আর আমায়িক ব্যবহার সত্ত্বেও যতবার সে ক্ষুধিত নেকড়ের মতো চোখ-দুটো তুলেছে আমার দিকে, ততবারই আতঙ্কে হাড়ে পর্যন্ত কাঁপন ধরে গেছে। এর ওপরও যখন শুনলাম, তার সর্বনাশে স্নেহদৃষ্টি পড়েছে আমার ওপর আর হ্যারিসের মতোই আমাকে তার ভালো লেগেছে, তখন তো বলতে গেলে হৃদপিণ্ডের স্পন্দনই থেমে গেছে।

কতটা যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি, বুঝিয়ে বলতে পারব না। একটি কথাতেও সন্দেহ হয় নি। আন্তরিকতায় গাঢ় এবং বর্ণনার প্রতিটি খুঁটিনাটিকে সত্যি বলে মেনে নিয়েছি—এতটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কন্ডাক্টরকে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে থাকতে দেখে

BanglaInternet.com

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে লোকটা!'

এককালে কংগ্রেস সদস্য ছিলেন, বেশ নামকরাই। এক তুষার ঝড়ে গাড়ির ভেতর আটকা পড়ে শুকিয়ে মরার দশা হয়। হিমে জমে এবং অনাহারে এত অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, পরের দু-তিন মাস বদ্ধপাগল হয়েছিলেন। এখন সেরে গেলেও কিছুটা মাথার গোলমাল রয়ে গেছে। সে ব্যাপারটার কথা উঠলে গাড়িসুদ্ধ জ্বলজ্যান্ত সব ক-টি মানুষকে খেয়ে সাবাড় করার আগে থামতে পারেন না। নেমে যেতে না হলে বোধ হয় এতক্ষণে সাবাড়ই হয়ে যেত সকলে। আর নামগুলোও সব বলে যান গড়গড় করে। নিজেকে ছাড়া সকলকে খেয়ে শেষ করে বলেন : 'তারপর প্রাতরাশের জন্যে নির্বাচনের সময় এলে আমি যথাযোগ্যভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলাম। আর কোনোরকম আপত্তি না-ওঠায় পদত্যাগ করলাম। তাই তো আজো বেঁচে রয়েছি।'

তা হলে এক নির্দোষ পাগলের পাগলামি শুনছিলাম : সত্যিকারে নরখাদকের গল্প নয়। মনের শান্তিও ফিরে পেলাম।

রচনাকাল : ১৮৬৮

জীবনের পাঁচটি উপহার

এক

জীবনের প্রথম উষায় এক আশ্চর্য পরী তার সাজি নিয়ে এসে উপস্থিত হল। বলল, এইসবই উপহার। এর মধ্য থেকে যে-কোনো একটি তুলে নাও। খুব সাবধানে, খুব চিন্তা করে; কারণ এর মধ্যে মাত্র একটিই মূল্যবান।

পাঁচরকম উপহার ছিল সেখানে। খ্যাতি, প্রেম, ঐশ্বর্য, আনন্দ এবং মৃত্যু।

আগ্রহ সহকারে তরুণ বলল, এখানে চিন্তা করার কিছুই নেই। এবং সে 'আনন্দ' বেছে নিল।

তারপর সে বিশ্বপরিক্রমায় নিজেকে নিয়োজিত করল। তারুণ্যের আনন্দের প্রাচুর্যে নিজেকে সমর্পিত করবার চেষ্টা করল নিঃশেষে। কিন্তু প্রত্যেকবারই তরুণ দেখতে পেল, সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, বেদনার্ত, নিষ্ফল আর শূন্য। এবং বিদায়-বেলায় সে আনন্দ বিদ্রূপাকীর্ণ।

আর তাই সবশেষে সে বলল, এই বছরগুলো আমি বৃথাই নষ্ট করলাম। আবার যদি আমাকে বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে আমি নিশ্চয়ই চিন্তা করে বেছে নেব।

দুই

পরী আবার এসে উপস্থিত হল। বলল : চারটে উপহার এখনো বাকি আছে। আবার বেছে নাও। আর মনে রেখো, সময় চলে যাচ্ছে—কাল অপেক্ষা করবে না কারো জন্যে । আর জেনো, এগুলোর মধ্যে মাত্র একটিই মূল্যবান।

অনেক চিন্তা করে লোকটি এবার 'প্রেম' বেছে নিল। কিন্তু পরীর দু-চোখের কোণে যে অশ্রুর রেখা টলমল করে উঠল, তা সে দেখতে পেল না। তারপর অনেক অনেক বছর পরে লোকটি নির্জন এক বাড়িতে একটি কফিনের সামনে বসে ছিল। আত্মগতভাবে সে বলছিল, একে একে ওরা সব আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আর এখন এই শূন্য বাড়িতে সে শুয়ে আছে নিঃসঙ্গ হয়ে, যে এসেছিল সবচেয়ে শেষে আর যে ছিল সবচাইতে প্রিয়। নিঃসঙ্গতার পর নিঃসঙ্গতার ঢেউ আমার ওপর বয়ে গেছে ঝড়ের মতো। ভালোবাসার কুহক থেকে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তার জন্যে আমাকে অসংখ্য মুহূর্তের বেদনার নিবিড় মূল্য দিতে হয়েছে। আর তাই আমি হৃদয়ের গহন থেকে ঘৃণা করি, অভিশাপ দিই—ভালোবাসাকে, প্রেমকে।

তিন

কী আশ্চর্য! পরী আবার এসে বলল, এবারও বেছে নাও। বহু বছরের অভিজ্ঞতা তোমাকে জ্ঞানের আলোর স্পর্শ দিয়েছে । তুমি এবার ভুল কর না। এখনো উপহার বাকি রয়েছে। আর এদের মধ্যে একটি মাত্র বিশেষ মূল্যবান। সেটা যেন রেখো আর ভেবেচিন্তে পছন্দ কর। এবারও যেন ভুল কর না।

সে অনেক ভাবল। তারপর বলল, আমাকে খ্যাতি দাও। আর পরী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল নিজের বিষণ্ন নির্জন পথে। তারপর আরো অনেক বছর অতিক্রান্ত হল নিঃশব্দে। একদা আসন্ন দিনান্তে যখন লোকটি বসেছিল একা একা আর ভাবছিল, তখন সেই পরী এসে দাঁড়াল তার পেছনে। পরী জানত, সে কী ভাবছে : আমার নাম বিশ্বভুবন জুড়ে ছেয়ে গেছে। সকল কণ্ঠ আমার নামের প্রশংসায় মুখর। ক্ষণিকের জন্য এটা আমার ভালোই লাগে । কিন্তু কত অল্পক্ষণের জন্যই না এই ভালো লাগা! তারপরই আসে ঈর্ষা, পরনিন্দা, আপবাদ আর ঘৃণা। আর তারপর নির্যাতন। এবং ক্রমে অসহনীয় বিদ্রূপ ও পরিহাস আসে সমাপ্তির সূচনা

Banglainternet.com

হয়ে। সবশেষে কৃপার দুঃসহ আগুনে পোড়াতে হয় নিজেকে। শেষ করতে হয় খ্যাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। হায়, খ্যাতির তিক্ততা আর যন্ত্রণা! প্রারম্ভে পঙ্কিলতার শিকার আর পতনের সময় ঘৃণা, অপমান আর করুণার পাত্র।

চার

আরো একবার বেছে নাও, আবার শোনা গেল সেই পরীর কণ্ঠ, দুটো উপহার এখনো বাকি আছে। বিমর্ষ হবার কোনো কারণ নেই। শুরুতে যে একটিমাত্র মূল্যবান উপহার ছিল, তা এখনো রয়েছে।

ঐশ্বর্য! হ্যাঁ, আমি কি অন্ধ ছিলাম। আমাকে ঐশ্বর্য দাও, সেই লোকটি বলল।—সবশেষে এবার আমার জীবনে বাঁচবার একটা অর্থ হবে। এবার আমি বাঁচার মতো বাঁচতে পারব। এবার আনন্দে ঝলসিত হবে জীবন। দু-হাতে ব্যয় করতে পারব—উৎসাহ, আনন্দ, ঔজ্জ্বল্যে। এইসব বিদ্রুপকারী আর উপহাসকারীর দল এবার আমার সামনে আবর্জনায় হামাগুড়ি দেবে। আর তাদের ঈর্ষার সতৃষ্ণ দৃষ্টি দেখে আমার ক্ষুধার্ত আত্মা শান্তি পাবে। সমস্ত বিলাসিতায় আমি ডুবে যেতে পারব, সমস্ত আনন্দে আমি উৎসারিত হব। মনের সঙ্গীত মূর্ছনায় আর দেহের তৃপ্তিতে, যা মানুষের সবচেয়ে প্রিয়—আমি তাতে সমর্পিত হব। পৃথিবীতে যা কিছু স্মরণীয়, শ্রদ্ধেয়, পূজনীয় সব আমি অর্থের বিনিময়ে কিনে নেব। একের পর এক কিনে যাব শুধু। বহু মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করেছি, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আমি চিনতে পারি নি—কিন্তু সেসব এখন অতীত। আমি তখন অজ্ঞ ছিলাম। আর সে-জন্যই আমাকে মায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

তিনটি বছর অতিবাহিত হল দেখতে দেখতে। তারপর একদিন দেখা গেল সেই লোকটি এক জীর্ণ চিলেকোঠায় বসে কাঁদছে। সে তখন দুর্বল, কৃশ। বিবর্ণ আর ফ্যাকাশে তার দৃষ্টি—ছেঁড়া কম্বল জড়ানো গায়ে। সে তখন শক্ত শুকনো কী যেন একটা চিবুচ্ছিল আর অস্ফুট স্বরে কী যেন বলছিল :

পৃথিবীর সমস্ত উপহারকে অভিশাপ দাও। কারণ সবই বিদ্রুপ আর মিথ্যে ঔজ্জ্বল্যের আবরণে ঢাকা। কারণ, সবই মিথ্যে। সবকিছু। এগুলো উপহার নয়, এগুলো সব ঋণ। আনন্দ, প্রেম, খ্যাতি, ঐশ্বর্য—এগুলো ভবিষ্যতের চিরন্তন সত্য—বেদনা, শোক, লজ্জা এবং দারিদ্র্যের ক্ষণিক ছদ্মবেশী রূপ মাত্র। পরী সত্যি বলেছিল, ওর সাজিতে একটি মাত্রই মূল্যবান উপহার ছিল। শুধুমাত্র একটি—যার মূল্য কোনোদিন কমবে না। বাকি সবগুলো আজ আমার কাছে কেমন সস্তা, নিচ আর মূল্যহীন বলে মনে হচ্ছে সেই আকাঙ্ক্ষিত একটির তুলনায়। সেই প্রিয়, সুন্দর, মধুর আর দয়াবান একটির তুলনায়। যা হৃদয়দহনকারী লজ্জা-অপমান-বেদনাকে এবং শরীরকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে যে যন্ত্রণা, তাকে স্বপ্নহীন নীরন্ধ্রী নিদ্রার গভীরে ডুবিয়ে দেয়। আনো! আমার জন্যে তাকে নিয়ে এস। আমি সত্যি ক্লান্ত। আমি ডুবতে চাই, বিশ্রাম নিতে চাই সেই অনন্ত স্বপ্নহীন নিঃসঙ্গ ঘুমের রাজ্যে।

পাঁচ

আবার সেই পরী ফিরে এল। মাত্র চারটি উপহারকে ফিরিয়ে নিয়ে। কিন্তু মৃত্যু সেখানে ছিল না। পরী বলল, আমি তা একটি ছোট্ট শিশুকে দিয়ে এসেছি। সে অবোধ শিশু। তাই বিশ্বেস করে তার জন্যে ভালো কিছু বেছে দিতে বলেছিল। কিন্তু তুমি তো কোনোদিন আমাকে তোমার জন্যে বেছে দিতে বল নি।

: আহ্, কী হতভাগা আমি! আমার জন্যে ওখানে আর কী রয়েছে?

: যা তুমি কোনোদিন আশা কর নি। বৃদ্ধ বয়সের ঘৃণা আর নিরবচ্ছিন্ন অপমান।—বিষণ্ন কণ্ঠে বলল পরী।

রচনাকাল : ১৯০২